৩৭ বর্ষ • ৩য় সংখ্যা • জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি	আশীষ লাহিড়ী	৩
বাংলায় বন্যা থেকে বাঁচা	কল্যাণ রুদ্র	৫
গো-বাঁচাও আন্দোলন	ভবানীপ্রসাদ সাহু	৯
ব্যায়ামাগার থেকে জিমনাসিয়াম	গৌতম মিস্ত্রি	১২
ছোটদের সঙ্গে বড়দের মেশা	অরুণালোক ভট্টাচার্য্য	১৭
আমেরিকায় সংবাদপত্র কমে আসছে	রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য	২০
ডাবরভাঙা খাল	মিলন দাস	২৩
দলিত নিগ্রহ	অভিরূপ ঘোষ	২৮
রান্নাঘরে কান্না	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১
চিঠিপত্র		৩২

সম্পাদক
সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিসঃ বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪
কার্যালয়
খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস- ৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬
ফোনঃ ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৬৫
ওয়েবসাইটঃ www.utsamanush.com
ইমেলঃ utsamanush1980@gmail.com

আমাদের কথা

প্রতুল মুখোপাধ্যায় দশক দুই আগে একটা গান বেঁধেছিলেন, গানের কথাগুলো সম্ভবত এরকম ছিল– 'ঘর পুড়েছে সব গিয়েছে, বলেন তো যাই কোথা/ সব চেয়ে বড় শত্রু এখন, সাম্প্রদায়িকতা।' তাঁর বর্ণনায়– 'নেতারা সব ভাষণ দিচ্ছেন, ময়দানে, মিনারে/ বুদ্ধিজীবী ব্যস্ত এখন ওয়ার্কশপ সেমিনারে।' শেষে তিনি জানান, 'কার পকেটে বিষের প্যাকেট, আমরা সেটা জানি/ কার ইশারায় সারা দেশে চলছে হানাহানি।'

রুজি-রোজগারের ধান্দায় দিন-কাটানো গরিব মানুষ অত গভীর তত্ত্ব আলোচনা বোঝেন না। অথচ তাঁরাই হানাহানির শিকার হন।

একথা আমরা বারবারই বলেছি, ধর্ম এমন এক জাদুদণ্ড যার সাহায্যে বিপুল সংখ্যক মানুষকে অতি সহজেই ইচ্ছামতো দিকে চালিত করা যায়। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতারা তা বিলক্ষণ জানেন। সুযোগ মতো তার প্রয়োগ করে থাকেন। আমাদের মতো দেশে যেহেতু ধর্ম আর রাজনীতি মাখামাখি করে থাকে, তাতে রাজনীতিক নেতারাই প্রয়োগ-দক্ষ।

আমরা বাংলার সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের গুণগান গাই। রবীন্দ্র-নজরুলের দোহাই দিই। আবার দাঙ্গাতেও মাতি। এ এক অদ্ভুত বৈপরীত্য! কিন্তু কেউ উস্কানি দিলেই দাঙ্গা! এর মূলে কি অন্য কারণ আছে? তার অনুসন্ধান বোধহয় জরুরি। আমাদের রাজ্যে বামপন্থীরা আজীবন ভণ্ডামি করে গেছে। বর্তমান শাসকদল আরেক কাঠি বাড়া। ভোট বড় বালাই। আর তার দিকে তাকাতে গিয়ে সংখ্যাগুরু মানুষের মনে সংখ্যালঘুদের প্রতি বিদ্বেষবিষ বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা বোঝার জন্য কোনো সেমিনারে, সভায় যোগ দেওয়া বা ভারী প্রবন্ধের বই পড়ার প্রয়োজন পড়ে না। বাসে-ট্রামে কান পাতলেই জানা যায়।

এটা ঠিক আমরা অফিসকাছারিতে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ বেশ মিলেমিশে, বন্ধুত্বপূর্ণভাবেই কাজ করি। পাড়ায় বাস করি। কিন্তু যখনই ধর্ম প্রসঙ্গ আসে, বিভেদের একটা কাঁটা মনে খচখচ করতে থাকে। একথা সত্যি, খ্রিস্টান, ইহুদি

ইত্যাদি ধর্মের মতো মুসলিম ধর্মের শিকড় ভিন দেশে। অন্তত বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। এটা কি কোনোভাবে বিভেদ-বিদ্বেষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়? উত্তরটা পণ্ডিতরাই দিতে পারেন। আমরা প্রশ্নটা তুললাম।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর ২১ বছর ঢাকা-বাসের অভিজ্ঞতা থেকে লিখছেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিন্দু ও মুসলমান প্রতিবেশী বন্ধুর ন্যায় পাশাপাশি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারবে, কিন্তু ভাই ভাই হয়ে এক বাড়িতে বা এক রাজ্যে বাস করা, তাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। তা চেষ্টা করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে– অর্থাৎ একান্নবর্তী পরিবারের ভাব দূরের কথা প্রতিবেশীসুলভ বন্ধুত্বও বজায় থাকবে না।' তিনি আরও লিখছেন, 'ইতিহাসের শিক্ষা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, মুজিবর রহমান যত চেষ্টাই করুন এবং সংবিধানে সাম্প্রদায়িক ভেদ বিলোপ করে এক-জাতীয়তা স্থাপনের আদর্শ প্রচার করুন– হিন্দু-মুসলমান তুল্য অধিকার নিয়ে সুখে শান্তিতে একত্রে বাংলাদেশে বসবাস করতে পারবে– এ আশা খুবই কম।' রমেশবাবুকে এমন মতামত পোষণের জন্য অবশ্য অনেকেই তাঁকে মুসলিম-বিদ্বেষী ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করে থাকেন।

১৯৪৬ থেকে শুরু করে ২০১৭– নানা সময়ে, নানা ছুতোয় প্রতিবেশীরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুযুধান হয়ে উঠছে। ওদিকে বাংলাদেশ থেকে এদিকে উত্তরপ্রদেশ, কাশ্মীর, বিহার বা পশ্চিমবঙ্গ– অন্ধ হয়ে থাকলেও প্রলয় বন্ধ থাকছে না। পুলিস-প্রশাসন অনেক ঘটনা প্রচারমাধ্যমে আসতে দিচ্ছে না বা দেয় না। তবে এখন অন্যান্য অনেক মাধ্যম তৈরি হয়ে যাওয়ায়, ইন্ধন বাড়ছেই। আর গুজব ছড়াতে হাওয়ায় যথেষ্ট। ইতিমধ্যে দেশজুড়ে গেরুয়া-ঝড় বইছে। তারা সুযোগের যোলআনা সদ্ব্যবহার করতে উঠেপড়ে লেগেছে। গরুর মতো নিরীহ প্রাণীই হয়ে উঠেছে সেই 'বিবাদের আপেল'। ভারতকে প্রায় উন্নত দেশ বলে গলাবাজি করলেও, আমাদের হাতে হাতে মোবাইল থাকলেও আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। সমস্যার শিকড় যে অনেক গভীরে। নিরীশ্বরবাদী সমাজতান্ত্রিকতা হয়ত এর মোকাবিলা করতে পারত। কিন্তু যাদের এগুলো করার কথা ছিল, তাদের মধ্যেই পচন ধরে গিয়েছে। আপাতত শুধু মানুষের শুভবুদ্ধির ওপর ভরসা করে থাকতে হবে। রবীন্দ্র-নজরুল, বাংলার ঐতিহ্য ইত্যাদির কথা বেশি বেশি করে বলে পুলটিস দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। পরমতসহিষ্ণুতার মন্ত্র জপতে হবে।

আমাদের রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে খড়্গপুর আইআইটি বড় গর্বের। বিশ্বজোড়া তার নাম। সেখানে এবার থেকে বাস্তুশাস্ত্রও পড়ানো শুরু হতে চলেছে সামনের আগস্ট মাস থেকেই। প্রাচীন ভারতে স্থাপত্যবিদ্যা উন্নত ছিল, তা নিয়ে কারও দ্বিমত নেই। বড় বড় মন্দিরই তার প্রমাণ। তবে সব ক্ষেত্রেই যেমন হয়, বিজ্ঞানের সঙ্গে ঢুকে পড়ে নানা ধর্মীয় গোঁজামিল। বাস্তুর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অবৈজ্ঞানিক নানা গাঁজাখুরি তত্ত্ব ঢুকে পড়েছে। শোবার ঘরের জানলা কোন দিকে হলে অর্থনৈতিক উন্নতি হবে, বাথরুম কোন মুখো হলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী, কোন টুংটাং শব্দকারী যন্ত্র গৃহে অখণ্ড সুখ এনে দেবে-- এসব ঢুকে পড়েছে। আইআইটি-র ছাপ পড়লে এই ব্যবসার রমরমা আরও বাড়বে।

জাল ব্যাপারটা ভারতে এক মহৎ শিল্প। তাই ডাক্তার জাল হবে, এতে আর আশ্চর্য কী! বড় বড় কর্পোরেট হাসপাতাল, কম পয়সা দিতে হয় বলে জাল ডাক্তার, নার্স পোষে। বেশ কয়েক বছর আগে ডাঃ সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছিলাম। পুলিস-প্রশাসন সবই জানে। হঠাৎ ঘুম ভেঙেছে। ফেসবুকে জাল রুগী নিয়ে বিস্তর তামাসা চলেছে। মানে ক্ষমতাশালীদের ধরা পড়লেই হাসপাতাল-বাস আর কি। এই জালের জাল গুটোতে গেলে নেতা, মন্ত্রীরাও বিপাকে পড়বেন। কিছুদিন শোরগোল, তারপর যে কে সেই!

শেষে কতগুলো উদ্বেগের কথা– একটি মেয়ে বাবা দামি মোবাইল কিনে দেয় নি বলে ফেসবুক-বন্ধু ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে টাকার রফায় রাত্রিবাস করে। মেয়েটিকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় উদ্ধারের পর পুলিশ জানে ঘটনাটি। এখন চাকরি বলতে তথ্যপ্রযুক্তি। খবর, এই চাকরির অনিশ্চয়তা, প্রবল কাজের চাপ, কর্মীদের অবসাদগ্রস্ত করছে। ঠেলে দিচ্ছে আত্মহত্যার দিকেও। আমরা অনেক বড় বড় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, এরকম ছোট বিষয়গুলো নিয়েও ভাবা দরকার।

আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি

আশীষ লাহিড়ী

(১)

হায় গো, ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায় গো!

ইদানীং আমরা গো এষণায় মজেছি। শুধু গো নয়, হনু এষণাতেও। থোড়বড়িখাড়া নট্ট কোম্পানির 'রামনবমীর টিনের তরোয়াল' আর খাড়াবড়িথোড় নাট্যসংস্থার 'বীর হনুমান শোলার গদা' পালা পশ্চিমবাংলা মাতিয়ে রেখেছে। তরোয়াল না গদা, কে হারে, কে জেতে তা নিয়ে টি-টোয়েন্টি আর ভোটপাগল বাঙালির রাতে ঘুম নেই।

সম্প্রতি সুকান্ত চৌধুরী মশাই আমাদের ছোটোবেলাকার সেই চিরপরিচিত গরুর রচনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন (আবাপ, ৩ জুন ২০১৭)। বিষয় রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু রচনা লেখা হবে গরু নিয়ে। কেননা ঠাকুরবাড়ির বজ্জাত চাকররা কীভাবে বালক রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রাপ্য দুধ থেকে বঞ্চিত করত, তার করুণ ও সফেন বিবরণ তো তিনি স্বয়ং 'জীবনস্মৃতি'তে লিখে গেছেন। অতএব রবীন্দ্রভক্ত ছাত্রটি ন্যায্যতই গরু নিয়ে লিখবে এবং বাংলায় একশোর মধ্যে আটানব্বই নম্বর পারে, এতে অবাক হবার কী আছে? সে যে ওই একটি রচনাই মুখস্থ করেছে। কিন্তু পণ্ডিত লোকদের নিয়ে বড়ো মুশকিল: ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল; ছিল গরু, হয়ে গেল হিটলার। সুকান্তবাবু ঘ্যাঁচ করে চলে গেলেন হিটলারের 'মাইন কাম্পফ'-এ (আমার সংগ্রাম): 'আপামর জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদী করে তুলতে হলে আধাখেঁচড়াভাবে করা চলবে না। করতে হবে নির্দয় ও একাগ্রভাবে, একটিমাত্র অভীষ্ট লক্ষ্য আঁকড়ে থেকে: দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভরা নয়, প্রবল ও চরম জাতীয়তাবাদ দিয়ে। ... বিদ্যার চেয়ে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়া অনেক বেশি শক্ত।' অগত্যা গরু স্বর্গ, গরু ধর্ম, গরুই পরম তপ, গরু প্রীত হলে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা। জাতে-কায়েত, কালাপানি-পার বিবেকানন্দ গোমাতার মনুষ্যদেহধারী সন্তানদের নিয়ে কীসব খারাপ খারাপ কথা বলেছিলেন, তা আপাতত শিকেয় তোলা থাক। আপাতত ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক গোল্যাজ, গোহিসি, গোশিং, গোবর্জ্য-তেজস্ক্রিয়া, গো-অন্নজানে মতি থাকুক আমাদের।

এদিকে প্রসিদ্ধ পরিবেশবিদ, একদা-যুক্তিবাদী মোহিত রায় বেশ একটা নতুন যুক্তির অবতারণা করেছেন দেখে ভালো লাগল। এতদিন আর এস এস-এর কাছে শুনতাম, গোমাংস ভক্ষণ প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে নিষিদ্ধ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্তর মতো কিছু তে-এঁটে পণ্ডিত অবশ্য বহুকাল প্রমাণ করে ছেড়েছেন, প্রাচীন হিন্দুরা একখানা বিফস্টেক পাতে পড়লে আহ্লাদে আটখানা হয়ে দাদাঠাকুরের মতো গান ধরতেন, 'আল্লা, দে আটখানা'। মনুসংহিতার যুদে হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) লিখেছিলেন, 'হিন্দুধর্মের এইরূপ অবস্থায় মদ্য-পান ও গো-মাংসাদি নানাবিধ মাংসভোজন সচরাচর প্রচলিত ছিল।–

> মাংস-ভোজন, মদ্য-পান ও স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গে দোষ নাই। এই সকল বিষয়ে প্রাণীদিগের স্বভাব-সিদ্ধ প্রবৃত্তিই আছে, কিন্তু নিবৃত্ত হইতে পারিলে মহাফল জন্মে। (মনুসংহিতা ৫। ৫৬)
>
> মধুপর্কে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে, পিতৃ-কৃত্যে ও দৈবকর্মে পশু বধ করা বিধেয় কিন্তু অন্য স্থলে নয়, এই কথা মনু বলিয়াছেন। (মনুসংহিতা ৫।৪১)

পূর্ব্বে মধুপর্কে অতিথিকে গোমাংস দান করিবার রীতি ছিল। প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন অনেকানেক গ্রন্থে এবিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত অতিথির অন্য একটি নাম গোঘ্ন অর্থাৎ গোহত্যাকারী। ভবভূতি এক স্থলে এবিষয়টি অতীব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। –

> ''সমাংসমধুপর্কঃ'' এই বেদ-বাক্যে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া গৃহস্থ লোকে বেদজ্ঞ অতিথিকে একটি নই-বাছুর বা বড় বৃষ অথবা বৃহৎ ছাগল প্রদান করে; ধর্মসূত্ররচয়িতা পণ্ডিতেরা এই ব্যবস্থা দেন (উত্তরচরিত, চতুর্থ অঙ্ক।)

ফলতঃ আমাদের ঋষি-মুনি প্রভৃতি সকলেই গো-খাদক ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। সে বিষয়ে পাদ্রি উইলসন ও শেখ অলিউল্লার সহিত ঋষিরাজ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কিছুমাত্র প্রভেদ দেখা যায় না।

তদ্ভিন্ন, সে সময়ে ছাগ, নানাপ্রকার মৃগ, শশারু, কূর্ম্ম, গণ্ডার, মেষ, বহুপ্রকার পক্ষী, শূকর ও মহিষের মাংস-ভোজন প্রচলিত ছিল। মহিষ-ভক্ষণটি বৈদিক ব্যবহার বোধ হয়। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উল্লিখিত মাংস সমুদায় দ্বারা পিতৃ-লোকের তৃপ্তি-সাধন করিবার বিশেষরূপ ব্যবস্থা আছে। (উৎসঙ্গ *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, উপক্রমণিকা (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৩); বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত করুণা প্রকাশনী সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭। দ্রষ্টব্য উৎস মানুষ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬)।

কিছুকাল ধরে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যর মতো নিষ্কর্মা কিছু লোক এসব কথা চারদিকে রটিয়ে বেড়ানোর ফলে আর এস এস-এর পুরোনো লাইনে আর কাজ হবে না, এটা বোঝা গেছে। তাই মোহিতবাবু এবিপি আনন্দয় বলেছেন, বেদের যুগে কী খাওয়া হত, না-হত, তা নিয়ে আধুনিক গো-চর্চাকারীদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তাঁরা চলতি হাওয়ার পন্থী, যে-হাওয়ার উৎস বেদ নয়, নাগপুর। অর্থাৎ এটা তিনি – তাঁরা? – স্বীকার করে নিলেন যে, ইতিহাস বলে, বৈদিক ভারতীয়রা গরু খেতে বড়ো ভালবাসত। বৃহদারণ্যকে তো এমন কথাও বলা হয়েছে, সর্বযুগে বিভূষিত, শ্রেষ্ঠ পুত্রসন্তান লাভের নিশ্চিত পন্থা হল, যৌন সংগমের আগে বাছুরের বিরিয়ানি খাওয়া (দ্রষ্টব্য উৎস মানুষ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬)।

খারাপ কী? গ্যলিলিওর পিছনে লাগাটা যে ভুল হয়েছিল, সেটা স্বীকার করতে তো ক্যাথলিক চার্চের চারশো বছর সময় লেগেছিল। মোহিতবাবুর মতো বিজ্ঞানীর সৌজন্যে আর এস এস যদি শ-খানেক বছরের মধ্যে এই বৈদিক ভ্রান্তিটুকু স্বীকার করতে পেরে থাকে, তাহলে তো বুঝতে হবে, হিন্দুরা অনেক এগিয়ে আছে। তাঁরা অনেকখানি বিশ্বাস থেকে অন্তত একটুখানি বিদ্যায় ফিরেছেন, এ কি কম কথা?

সুকান্তবাবুর মতো পণ্ডিত মানুষ যদি ভারতীয় গরুর খেই ধরে জার্মান হিটলারে পৌঁছে যেতে পারেন, তাহলে আমি গরু আর হনুমানের যুগ্ম ল্যাজ ধরে দ্বিতীয় এক জার্মানের কাছে পৌঁছে গেলে কেউ নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না। প্রচুর গো-এষণার ফলে, প্রায় মিনিট তিনেকের প্রগাঢ় পরিশ্রমে আমি আবিষ্কার করেছি, ১৮৫৩ সালে আমার এই জার্মান সাহেবটি ইংরেজি ভাষায় লিখেছিলেন : 'খুন জিনিসটাই হিন্দুস্তানে একটা ধর্মীয় আচার।' বাস্তবিক, বলি মানে তো খুনই। তিনি আরো লিখেছিলেন, হিন্দুস্তানের লোকেরা 'প্রকৃতির পূজাকে একটা পাশবিক পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। সেই অধঃপতনের বহিঃপ্রকাশ এই যে মানুষ, যে প্রকৃতিতে সার্বভৌম, সে কিনা নতজানু হয়ে পূজা করছে হনুমান নামক একটা বাঁদরকে আর শবলা নামক একটি গরুকে!' জানি, আজকের উত্তরাধুনিক দুনিয়ায় মানুষকে প্রকৃতিতে সার্বভৌম-টৌম বলা মোটেই ফ্যাশনদুরস্ত নয়, উচিতও নয়। কিন্তু বাঁদর আর গরু নিয়ে আমাদের এই প্রাক্-আধুনিক অব্‌সেশনটাকে ওই জার্মান সাহেব ১৬৪ বছর আগে কী করে ধরে ফেলেছিলেন, ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে। লক্ষ্মণের শক্তিশেল-এর দেশে গো-বানর পূজার এই প্রত্যাবর্তন – নাকি প্রবর্তন? – দেখলে একটাই কথা মনে পড়ে যায় : সত্য সেলুকস, কী বিচিত্র এই দেশ!

ভুল বললাম, আরেকটা কথাও মনে পড়ে; সেটাও ওই জার্মান সাহেবেরই : ইতিহাসে প্রতিটি ঘটনা যেন পুনরাবৃত্ত হয়; তফাত এই, প্রথমবার হয় ট্রাজেডি রূপে, দ্বিতীয়বার হয় প্রহসন রূপে। আমরা এখন কী দেখছি : ট্রাজেডি, না প্রহসন? সমাজবিজ্ঞানীরা এ নিয়ে গো-এষণা করুন।

পুনশ্চ : আজকাল কুইজ জিনিসটা খুব জনপ্রিয়: ভারতের রাজধানীর নাম কী, তাজমহল কোথায় অবস্থিত, কাশ্মীরে বরফ পড়ে কিনা, কাজিরাঙ্গায় গণ্ডার পাওয়া যায় কিনা, এইসব কঠিন কঠিন জিকে-র প্রশ্নে মোবাইল ছয়লাপ। সেই মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করে আমি এই দ্বিতীয় জার্মান সাহেবটির নাম চেপে গেলাম। উৎস মানুষের পাঠকরা বলুন, তিনি কে? এবং তাঁর জন্মর দুশো বছর পূর্ণ হতে আর কদিন বাকি? বাড়তি ক্লু : হিটলারের শুধু গোঁফ ছিল; আমার জার্মান সাহেবের গোঁফ-দাড়ি দুই-ই ছিল।

উমা

বাঁধ বন্যা বিপর্যয়

ফি বছর বর্ষা মানেই বন্যা। বন্যা নিয়ে এর আগে আমাদের দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বন্যা এখনও প্রাসঙ্গিক। তাই সমসময়কে ধরে উৎস মানুষ প্রকাশ করতে চলেছে নতুন সঙ্কলনগ্রন্থ।

বাংলায় বন্যা থেকে বাঁচা বা বন্যাকে নিয়ে বাঁচা

কল্যাণ রুদ্র

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র আর মেঘনা — এই তিনটি বড় নদীর বিপুল জল ও পলির স্রোত এই বাংলার মধ্য দিয়ে বয়ে যায়। সারা বছর এই তিন নদী ও তাদের উপনদী দিয়ে যত জল প্রবাহিত হয় তার প্রায় ৮০ শতাংশ বয়ে যায় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। এই তিন মাসের প্রবাহেও বৈষম্য ঘটে, কখনও বিপুল জলস্রোত দু কূল ছাপিয়ে প্লাবনভূমিকে ভাসিয়ে দেয়; ডুবে যায় গ্রাম-শহর, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যোগাযোগ ব্যবস্থা। কিন্তু এই বিপর্যয়ের হাত ধরে আসে সৃষ্টির বার্তা; বন্যার জলের সঙ্গে ভেসে-আসা পলিতে কৃষিজমি নতুন প্রাণ ফিরে পায়। বাংলার কৃষকেরা বন্যার সঙ্গে ঘর করেছে অনাদি কাল থেকে; মনে রাখতে হবে, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, উজ্জ্বল সূর্যালোক আর নদীর জলে ভেসে-আসা পলি বাংলার কৃষিক্ষেত্রকে এত সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু গত তিন শতকে কীভাবে কৃষি-জল-পলির এই আন্তঃসম্পর্ক ধীরে ধীরে বদলে গেল সেই আলোচনাই এই নিবন্ধের বিষয়।

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাঙ্ক আগস্ট ২০১৫। আবার দক্ষিণবঙ্গ বানভাসি, ১২টি জেলার ১৬,৪১৪টি গ্রাম প্লাবিত, ১,২৪,৯৯৮ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে, শুধু কৃষিক্ষেত্রেই ক্ষতির পরিমাণ ১৫,০০০ কোটি টাকা। মৃত্যু হল ৯৭ জনের। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। সরকারি হিসেবে সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২১,০০০ কোটি টাকা। এই বন্যার প্রাথমিক কারণ এক নিম্নচাপ জনিত অতিবৃষ্টি, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডিভিসি ও মশানজোর জলাধার থেকে ছাড়া জল ও হুগলি নদীতে ধেয়ে-আসা ভরা কোটাল। মেঘনাদ সাহা বলেছিলেন, উদ্বৃত্ত জল ও তার

অসম বণ্টন বাংলার সমস্যা। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমস্যার বিশেষ হেরফের হয় নি, বর্ষায় বন্যা ও নদীভাঙন এবং শুখার সময় তীব্র জলাভাব, আমাদের সহজাত সমস্যা। বন্যা হলে ত্রাণের জন্য হাহাকার, সরকারের সাধ্যমতো চেষ্টা, পারস্পরিক দোষারোপ— এসব আমাদের চেনা ছবি। এবারের বন্যাও সেই একই ছবি দেখাল। সেই ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে স্বাধীনতা-উত্তর ছয় দশক ধরে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা কম হয় নি, কিন্তু খুব বেশি সফলতা অর্জন করা যায় নি; বরং প্লাবিত এলাকার ব্যাপ্তি ও সময় দুই-ই বেড়েছে। আগে যে বন্যার জল দুই বা তিন দিনে নেমে যেত, এখন তা নিকাশী পথ না পেয়ে জমে থাকছে দীর্ঘ সময়। এর কারণ জানতে ফিরে যেতে হবে সেই ঔপনিবেশিক পর্বে। একই সঙ্গে জানতে হবে ভূ-উষ্ণায়নের প্রভাবে কতটা বদলেছে বৃষ্টিপাতের ধরন।

নদীশাসন ও কৃষি-অর্থনীতিতত্ত্ব অতীতে বাংলার কৃষকেরা বন্যার জল ও পলি ব্যবহার করতেন এক অসাধারণ দক্ষতায়। বন্যার জল দু কূল ছাপিয়ে প্লাবনভূমিতে নতুন পলি ছড়িয়ে দিত। দুই বা তিন দিন পর জল নেমে গেলে কৃষকেরা সেই জমিতে বীজ ছড়িয়ে দিতেন— ধান, কলাই, আরও কত কী! কোনো রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছাড়াই প্রচুর ফসল ফলত। অগ্রহায়ণে কৃষকেরা মেতে উঠতেন নবান্ন-র উৎসবে। জল, পলি ও প্লাবনভূমির এই আন্তঃসম্পর্কটি ছিল বাংলার কৃষি-অর্থনীতির ভিত্তি। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলার নদী ও কৃষি ব্যবস্থার আন্তঃসম্পর্কটি ধীরে ধীরে বদলে যায়। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশরা তৈরি করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে তার একাংশ ব্রিটিশ রাজকে পৌঁছে দেওয়ার বরাত দেওয়া হল জমিদারদের। সেই সময় থেকেই শুরু হল বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার এক ব্যাপক কর্মকাণ্ড। উত্তরবঙ্গ থেকে সুন্দরবন, সর্বত্র নদীর দুই পাড়ে মাটির বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হল। এই ব্যবস্থার ফলে প্রথম পর্যায়ে ছোট ব্যাপ্তির বন্যা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হল। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ফল হল বিপ্রতীপ। বন্যার সময় যে পলি প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে যেত, সেই পলি নদীখাতে সঞ্চিত হতে থাকল। এছাড়া বৃষ্টির জল নদীখাতে গড়িয়ে যাওয়ার পথও বন্ধ হল। নদীর জল-ধারণ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে গেল। এখন বড় বন্যার সময় একবার বাঁধ ভাঙলে বন্যার জল নদীখাতে ফিরে আসার পথ পায় না। অন্যদিকে, নদী তার স্বাভাবিক ধারণক্ষমতা হারিতে শ্লথ হয়ে গেল। ১৯২৭ সালে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখেছিলেন— পাড়বাঁধ বা এমব্যাঙ্কমেন্ট সাময়িকভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করলেও নদীখাতে পলি সঞ্চয় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ১৯৩০ সালে প্রখ্যাত সেচ বিশেষজ্ঞ স্যার উইলিয়াম উইলকক্স দামোদরের বাঁধকে 'শয়তানের শৃঙ্খল' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ১৯৪২ সালে অবিভক্ত বাংলার মুখ্য বাস্তুকার সুবোধচন্দ্র মজুমদার বলেছিলেন, এমব্যাঙ্কমেন্ট বা পাড়বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বন্ধক রেখে বর্তমান প্রজন্মের স্বার্থ সিদ্ধি করা। নদীশাসনের এই ঔপনিবেশিক ধারা আজও অব্যাহত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে নদীর পাড় ধরে নির্মিত প্রায় ১০,৫৫০ কিমি দীর্ঘ এমব্যাঙ্কমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করে রাজ্য সেচ দপ্তর। এ কথা সত্য যে, এই বাঁধগুলি ভেঙে ফেলে নদীকে মুক্ত করে দেওয়া এখনই সম্ভব নয়, কারণ পার্শ্ববর্তী গ্রাম-শহরের বসতি বিপন্ন হবে। তবে পরিকল্পিতভাবে প্লাবনভূমির বিভিন্ন অংশে পর্যায়ক্রমে বন্যার জল ও পলি ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। তাতে একাধারে নদী গভীর হবে, কৃষিজমিও নতুন পলিতে ফিরে পাবে হারানো উর্বরতা। তবে, এ জন্য প্রয়োজন একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা।

শুধু এমব্যাঙ্কমেন্ট বা পাড়বাঁধ নয়। নদীর মরে যাওয়া বন্যার তাণ্ডব বৃদ্ধির নেপথ্যে রয়েছে আরও অনেক কারণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার রেল ও সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়। মূল লক্ষ্য ছিল, বাংলার কাঁচামাল দ্রুত কলকাতা বন্দর হয়ে ইংল্যান্ডে পৌঁছে দেওয়া এবং সেখান থেকে উৎপাদিত দ্রব্য ফিরিয়ে এনে এ দেশের বাজারে বিক্রয় করা। অর্থাৎ, বাংলা তখন একাধারে কাঁচামালের উৎস ও বাজার। নদীবিশেষজ্ঞ স্যার আর্থার কটন বুঝেছিলেন যে, রেল ও সড়ক পথ জলের নিকাশি পথকে ব্যাহত করবে, তাই তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, সড়ক বা রেলপথ নয় নদীপথে বাণিজ্য করাই কাম্য। কিন্তু ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, শুধু বাণিজ্যিক স্বার্থে নয়, বিদ্রোহ দমনে ও সৈন্যবাহিনীর দ্রুত যাতায়াতের জন্যও প্রয়োজন রেল ও সড়ক পথ। ঔপনিবেশিক শাসকরা সিদ্ধান্ত নিল এমনভাবে রেলপথ নির্মাণ করতে হবে যাতে বন্যার সময় যোগাযোগ ব্যাহত না হয়। ধার থেকে মাটি কেটে উঁচু বাঁধের ওপর লাইন পাতা হল। জঙ্গলমহলের শাল গাছ নির্বিচারে কেটে তৈরি হল রেলের স্লিপার। কিন্তু রেললাইনের নীচে বন্যার জল নিকাশের জন্য যতটা প্রশস্ত পথ প্রয়োজন, তা রাখা

হল না। এই কর্মকাণ্ডের ফল হল সুদূরপ্রসারী। একদিকে বন্যার ব্যাপ্তি বাড়ল, অন্যদিকে রেললাইনের পাশের গর্তে জমা জল ম্যালেরিয়ার মশার আঁতুড় ঘর হয়ে উঠল। গ্রামবাংলায় ম্যালেরিয়া মহামারী হয়ে দেখা দিল। এ প্রসঙ্গে ইন্ডিয়ান মিরর (২১.১২.১৯০৭) লিখেছিল — ''*To protect the EI railroad from Burdwan onwards, a high embankment was constructed on the east bank of the Damodar to stop the floods. The PWD extended their operations to the other rivers like Rupnarayan, Selye, Cossye and other rivers in Midnapur and Orissa. Wherever embankments were thrown up, tanks and artificial lakes were choked with weeds and crops suffered from want of fertilizing silts. Scarcity and famines have become more frequent and severe, and plague and fever are caused*" মেঘনাদ সাহা ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও অপ্রশস্ত কালভার্ট রেখে তৈরি রেলপথের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। অধ্যাপক সাহা লিখেছিলেন— ''*If there be anything like justice in the world, the people of Burdwan are entitled to compensation from parties concerned, for these terrible inflictions on them.*" উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ঃ ''*The railway authorities in North Bengal build railways with insufficient waterways. These are responsible for devastating flood and outbreak of malaria in North Bengal as well as for fall in fertility of soil.*"

১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গে এক ভয়াবহ বন্যার পর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছিলেন — ''*The Government is criminally and wilfully responsible for the great havoc ... unless the narrow culverts were replaced by bridges of long span they would always be liable to the calamity of flood. And this is what exactly happened. The fact is that railway lines are always constructed with an eye to the interest of foreign shareholder. The less the cost, greater the expectation of dividend.*" রাধাকমল মুখার্জি তাঁর *চেঞ্জিং ফেস অভ বেঙ্গল* গ্রন্থে লিখেছিলেন— ''*A systematic policy of road and railway construction in the eastern districts of Bengal would be repetition of the mistakes, which have contributed in no small measure to the economic decline of the central and western Bengal. More attention should be diverted to the policy of the improvement of waterways and inland navigation, the making of new waterways by means of cuts, where none exists at present, the easing of bad bends of rivers and clearance of aquatic weeds in waterways. The German policy of 'raiway and waterway' rather than 'railway versus waterway' is nowhere so indispensable as in the Eastern Bengal, where water-borne traffic is still one of the largest in the world.*"

নদী অববাহিকায় নানা ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডের সেই ধারা অব্যাহত ছিল স্বাধীনতা লাভের পরও। ১৯৫৩ সালে জমিদারি প্রথা বিলোপের পর জমিদাররা অনেক গাছ কেটে বিক্রি করার পর সরকারকে জমি হস্তান্তর করেছিলেন। ফলে ধীরে ধীরে বদলে গেছে বাংলার রূপরেখা, বেড়েছে ভূমিক্ষয় ও নদীতে পলি সঞ্চয়ের পরিমাণ।

ডিভিসি ও বন্যাঙ্ক দামোদর এক বিরল নদী। প্রায় ২২ হাজার বর্গ কিমি বিস্তৃত অববাহিকার উজানে সঞ্চিত আছে প্রচুর কয়লা আর ঔপনিবেশিক কালে নিম্ন অববাহিকা কৃষি উৎপাদনে ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। তবু সাহেবরা এই নদীকে বলত 'বাংলার দুঃখ'। বন্যা-নিয়ন্ত্রক পাড়বাঁধ তৈরির পর কীভাবে প্লাবনভূমি আর নদী বিচ্ছিন্ন হল, সেই ইতিহাস আমরা আলোচনা করেছি। স্বাধীনতা-উত্তরকালে এল বড় বাঁধের অর্থনীতি। তৈরি হল ডিভিসি, মশানজোড়, কংসাবতী জলাধার; খালের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে গেল বিস্তীর্ণ এলাকায়। কিন্তু প্রত্যাশা আঘাত খেল কয়েক বছরের মধ্যেই। বন্যানিয়ন্ত্রণে ডিভিসি জলাধারের ক্রমহ্রাসমান ধারণক্ষমতা ব্যর্থ হল। এর কারণ দুর্বোধ্য নয়। প্রথমত জলাধারগুলির ধারণ ক্ষমতা সীমিত। পলি জমে তা প্রতি বছর আরও কমে যাচ্ছে। এই সীমিত ক্ষমতায় উজানের সব জল ধরা যায় না। অতিবৃষ্টি হলে জল ছাড়তেই হয়, না ছাড়লে বাঁধ ভেঙে আরও বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে। ফলে বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য নির্মিত জলাধারই নিম্ন দামোদর এলাকার বন্যাকে বাড়িয়ে দেয়। বাঁধ থেকে ছাড়া জল, নিম্ন দামোদর অববাহিকার বৃষ্টির জল আর হুগলি নদীর জোয়ারের জল— এই ত্র্যহস্পর্শে বন্যা পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। ডিভিসি যে বন্যানিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু যে কথা বলা হয় না, তা হল, অত্যধিক সেচের জলের জোগান দিতে

জলাধার	অববাহিকার বিস্তৃতি (বর্গ কিমি)	প্রাথমিক ধারণক্ষমতা (১০ লক্ষ ঘন কিমি)	পলি সঞ্চয় ধারণক্ষমতা (১০ লক্ষ ঘন কিমি/বছর)	২০১৩ পর্যন্ত ধারণক্ষমতা হ্রাস	
				(১০ লক্ষ ঘন কিমি)	% হিসেবে
মাইথন (১৯৫৫)	৬২৯৪	১৩৪৮.৪৪	৬.৭৭	৩৯৯.৪৪	২৯.৬২
পাঞ্চেত (১৯৫৬)	১০৮৭৮	১৫৮১.১২	৫.৫৭৩	৩২৩.২৩	২০.৪৪
তিলাইয়া (১৯৫৩)	৯৮৪.২	৩৩৫.৪৪	২.৮১২	১৬৮.৭২	৫০.২০
কোনার (১৯৫৫)	৯৯৭.১৫	২৮১.২৫	১.৭৪৬	১০৩.০১	৩৬.৫৯

দুর্গাপুর ব্যারেজের নীচে দামোদর এখন বালির নদী, আমাদের অলক্ষ্যেই এই নদী হারিয়ে যাচ্ছে।

ভূ-উষ্ণায়নের প্রভাবঃ একদিকে চাহিদা বাড়ছে অপ্রতিহত গতিতে, অন্যদিকে ভূ-উষ্ণায়নের প্রভাবে টান পড়ছে জলের জোগানে। সঙ্কটের অন্য একটি কারণ হল, জল ব্যবহারের নানা ক্ষেত্রে বিপুল অপচয়। ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)-র চতুর্থ প্রতিবেদনে (২০০৭) বলা হয়েছিল, ১০ দক্ষিণ অক্ষাংশ থেকে ৩০ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অর্থাৎ যেখানে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশ অবস্থিত, সেখানে ১৯৭০ সাল থেকে বৃষ্টি কমছে, উষ্ণতা বাড়ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত আইপিসিসি-র পঞ্চম প্রতিবেদনে (২০১৩) বলা হয়েছে, মৌসুমি বায়ু প্রভাবিত এলাকায় বর্ষাকাল দীর্ঘায়িত হচ্ছে, শুখা মরশুমের বৃষ্টি কমছে। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে বৃষ্টিপাতের ধরন। অল্পসময়ে অতিবৃষ্টি, তারপর দীর্ঘসময় ধরে অনাবৃষ্টি প্রায়শই আমাদের কৃষি অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। বাড়ছে খরা ও বন্যার প্রকোপ। উত্তাপ বাড়ার ফলে বাষ্পীভবন বাড়ে, কমে যায় ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ। এক কথায় বলা যায়, জলচক্রের স্বাভাবিক ছন্দে বিঘ্ন ঘটছে, শুধু কৃষি-অর্থনীতিতেই নয়, আঘাত লাগছে বাস্তুতন্ত্রেও। পশ্চিমবঙ্গে ১৯০১-২০০২ সালের জলবায়ু সংক্রান্ত নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ওই সময়কালের মধ্যে জুন মাসের বৃষ্টি প্রায় ৪৮ মিলিমিটার কমেছে আর সেপ্টেম্বর মাসের বৃষ্টি বেড়েছে প্রায় ৩১ মিলিমিটার। আরও উল্লেখ্য, জুন মাসের বৃষ্টি প্রতি বছর প্রায় ১ মিলিমিটার হারে কমছে। বৃষ্টিপাতের ছন্দে এই পরিবর্তনের জন্য কোনও কোনও বছর আমন ধান রোপনের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে; যে চারা জুনের শেষে বা জুলাইতে রোপন করার কথা, তা পিছিয়ে যাচ্ছে আগস্ট মাসে। আবার অতিবৃষ্টিও উৎপাদনের ক্ষতি করছে। সব মিলিয়ে নানা সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষকেরা জর্জরিত।

বন্যা মোকাবিলা প্রস্তুতিঃ যে সহজ সত্য অনুধাবন করা প্রয়োজন, তা হল, এই বাংলায় বন্যা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। ওই বিপুল জলস্রোত নদীখাতে বা জলাধারে ধারণ করা যায় না, প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে যাওয়া অনিবার্য। তবে আগাম প্রস্তুতি থাকলে মানুষের দুর্দশা অনেকটাই লাঘব করা যায়। যেসব প্রস্তুতি আগাম নিতে হবে তা হল — ১। বন্যাপ্রবণ এলাকার মানচিত্র নির্মাণ। ২। নিকাশী ব্যবস্থার সংস্কার, বিশেষত রেল ও সড়ক পথের নীচে প্রশস্ত কালভার্ট নির্মাণ করা। ৩। গৃহ নির্মাণ কৌশলের আধুনিকীকরণ যাতে বাড়ি সহজে না ভেঙে পড়ে। ৪। বন্যার সময়ের জন্য আশ্রয়স্থল নির্মাণ। ৫। কৃষকদের জন্য শস্যবিমা চালু করা। ৬। বন্যার আগাম সতর্কতা দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নেটওয়ার্ক তৈরি করা। ৭। বন্যার আগেই ত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয় জল, ওষুধ, ওআরএস, ব্লিচিং, জ্বালানি ইত্যাদি মজুত রাখা। ৮। বিপন্ন মানুষদের উদ্ধারের জন্য নৌকা প্রস্তুত রাখা। ৯। ডিভিসি ও রাজ্য সেচ দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং জলাধারে জমা জলের পরিমাণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা। ১০। প্রতিটি গ্রামে উদ্ধার কাজ ও ত্রাণ বিলির জন্য সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা।

এই বাংলায় ভৌগোলিক কারণেই বন্যাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় বলেই এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে মানুষের দুর্দশা ও ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব। বন্যাকে নিয়ে বাঁচাই আমাদের ভবিতব্য।

উমা

গো-বাঁচাও আন্দোলনের কালো মেঘ

ভবানীপ্রসাদ সাহু

বেশ কিছুদিন ধরে দেশ জুড়ে গরু-মোষ নিয়ে একটা হৈ-হল্লা চলছে। অবস্থা এমনি যে গো-পালকেরা ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছেন। অনেক রাজ্যই গো-হত্যা নিষিদ্ধ করেছে। কসাইখানায় বন্ধ্যা গরু-মোষ বেচতে গেলেও বিপদ। অবস্থা এমনই, নিজে না খেয়েও চারপেয়েকে খাওয়াও। চর্মশিল্পের সঙ্গে যুক্ত লাখো মানুষ এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। এক অদ্ভুত জুলুম মানুষের ঘাড়ে চেপে বসেছে, যা রুখতে না পারলে সমাজকে চরম মূল্য দিতে হবে। গো-বধ নিষিদ্ধ, গো-মাংস খাওয়া চলবে না, বাড়ি বাড়ি ঢুকে তল্লাশি চালানো হচ্ছে, ফ্রিজে মাংস পেলেই হল! তা কিসের, পরীক্ষা করার প্রশ্নই নেই। আগে পেটাও, খুন করো, ঘরে আগুন লাগাও। এ এক ভয়ানক অরাজক অবস্থা! স্রেফ ধর্মীয় জিগির তুলে একদল মানুষ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। গো-হিসি, গো-পটি অনলাইনে, পোস্টঅফিসে গঙ্গাজল বিক্রি! ভাবা যায়! বছর বিশেক আগেই এসবের খুঁটিপুজো চালু হয়ে গিয়েছিল। সে সময় আমাদের পত্রিকায় তা নিয়ে গুটি কয়েক লেখা প্রকাশিত হয়। তার থেকেই এই লেখাটি প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় বেছে নেওয়া হল।– সম্পাদক

আগামী ১৪ জানুয়ারি, ১৯৯৬ তারিখে গঙ্গা-যমুনা (ও সরস্বতী)-র সঙ্গমস্থলে লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ হতে চলেছে। অবশ্য এঁরা নিজেদের 'মানুষ' হিসেবে পরিচয় দিতে যতটা না আগ্রহী, তার থেকে বেশি আগ্রহী হিন্দু হিসেবে পরিচয় দিতে। এইসব হিন্দুদের জড়ো করবে ভারতের হিন্দু মৌলবাদীদের সবচেয়ে জঙ্গি যে অংশ, সেই বজরং দল। এরা সারা দেশ জুড়ে গোহত্যা বন্ধ করার কঠোর শপথ গ্রহণ করবে। সমাবেশ সংগঠিত করার দায়িত্ব বজরং দল নিলেও, প্রধান উদ্যোক্তা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অশোক সিংঘল জানিয়েছেন, 'গোহত্যার ওপর নিষেধাজ্ঞা আমরা যে কোনো মূল্যেই আদায় করব। এবং যাই-ই ঘটুক না কেন, আমরা শেষ অবধি লড়াই করব।'

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে সারা দেশ জুড়ে প্রবল হিন্দুত্বের হাওয়া তোলাই যে এমন মরিয়া আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। তা তাঁরা গোপন করেন না। অর্থাৎ, গরুর প্রতি দরদের চেয়ে, গাড়ির প্রতি আগ্রহই বেশি। মূল লক্ষ্য ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করা। তাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি জানিয়েছেন, 'নির্বাচনের ওপর আমাদের আন্দোলন অবশ্যই প্রভাব ফেলবে।' অযোধ্যার 'বিতর্কিত' সেই সৌধ ভাঙার আগে যেভাবে সঙ্কীর্ণ হিন্দুত্ববাদী হাওয়া তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল, গোহত্যা বন্ধের এই আন্দোলনকেও ঐ পর্যায়েই নিয়ে যাওয়া হবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুব শাখার প্রধান মন্তব্য করেছেন, 'অযোধ্যার ঐ সৌধ ভাঙার জন্য সরযূ নদীর তীরে সাধুরা যেমন শপথ নিয়েছিল, এবারও সেটিই ঘটবে।' বজরং দল ইতিমধ্যেই সারা দেশের কসাইখানার তালিকা প্রস্তুত করে ফেলেছে। ১০০টি জিপগাড়ি করে দেশের ৬০০ জেলায় তারা ঘুরবে এবং তীব্র প্রচার চালাবে। এইসব জিপগুলিকে ডাকা হবে 'গোরক্ষা রথ' নামে। কসাইখানাগুলিকে জোর করে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হবে।

কিন্তু ব্যাপারটি যে এখানেই শেষ হবে না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গরুর সঙ্গে হিন্দুত্বের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। শুয়োরের মাংস খাওয়া যেমন মুসলিমদের পক্ষে একান্তই ধর্মবিরোধী ব্যাপার, হিন্দুদের ক্ষেত্রে গোমাংস

প্রসঙ্গেও একইভাবে ব্যাপারটি সত্যি। হিন্দুরা গরুকে তাদের 'মা' হিসেবে গণ্য করে। ধর্ম বা হিন্দুধর্ম বলতে আর যাই-ই বোঝাক না কেন, এই হিন্দুবাদীদের কাছে গোহত্যা নিবারণের সঙ্গে তা একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে যুক্ত। রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের জন্য তারা বিষয়টিকে হিংস্র পর্যায়ে নিয়ে যেতেও দ্বিধা করবে না।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ সহ হিন্দুত্ববাদী এইসব সংস্থা ও তার সাধুরা অতি উত্তেজক প্ররোচনামূলক কথাবার্তা ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করে দিয়েছেন। গত অক্টোবরে সমাপ্ত হওয়া তিন সপ্তাহব্যাপী 'একাত্মতা যাত্রা'তেই তার আঁচ পাওয়া গেছে। আসলে এই 'একাত্মতা যাত্রা'-র 'শো'টি ছিল কতিপয় হিন্দুদের একাত্ম করার যাত্রা, সর্ব-মানবিক ঐক্য বা ভারতীয়দের একাত্ম করার উদ্দেশ্য নয়। তাই মহারাষ্ট্রের বাসটেক-এ এই যাত্রার এক সাধু হুঙ্কার ছেড়ে শ্রোতাদের আহ্বান জানিয়েছেন, 'যারা গরুর এক বিন্দু রক্তপাত করে তাদের শিরচ্ছেদ করতে হবে।' এর আগেও, অযোধ্যার সৌধ ধ্বংস করার আগে, ফৈজাবাদের নানা এলাকায় দেওয়াললিপি ছিল, 'যারা গোহত্যা করে তাদের মৃত্যু চাই।' তারই ধারাবাহিকতায় অক্টোবরের ২০ তারিখে, ঐ 'যাত্রা'র অন্তিম দিনে অশোক সিংঘল বিভ্রান্তিকর ও আবেগমথিত ভাষায় জানিয়েছেন, এদেশে প্রতিদিন ৫০ হাজার গোহত্যা করা হয় এবং 'দেশের প্রতিটি নদী বেয়ে গোরক্ত বয়ে চলেছে। ধর্মাচরণ করার কোনো স্থান আর এখানে নেই।'

আসন্ন এই ভয়াবহ হিন্দু মৌলবাদী কর্মসূচীর প্রাক্-মুহূর্তে মনে আসে, সত্যিই কি এভাবে গোহত্যা বন্ধ করা আমাদের দেশের জনসাধারণের আশু কর্তব্য? আর কোনো সমস্যা নেই? আর কোনো প্রাণীর হত্যা রোধ করারও কি প্রয়োজন নেই? রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই মৌলবাদী জঙ্গি কর্মসূচী শুধু বিপুলসংখ্যক জন্মসূত্রে হিন্দু ভারতীয়দের বিভ্রান্তই করবে না, এই সুযোগে বিশেষত মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী কয়েক কোটি ভারতীয়দের বিরুদ্ধেও আবার নতুন করে ঘৃণা ও হিংসার বিষবাষ্প নিক্ষেপ করবে। এসবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ভয়াবহ দাঙ্গা ও নরহত্যা ঘটা অসম্ভব নয়। কয়েকটি গরু বাঁচাতে কয়েক শত মানুষ প্রাণ দেবে।

এটা ঠিকই যে অকারণে কোনো প্রাণী হত্যা অবশ্যই নিবারণ করা দরকার। প্রাকৃতিক কারণে কিছু বিলুপ্তপ্রায়, বিরলপ্রজাতির বা বিপন্ন অস্তিত্বের প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের দেশে গরু ঐ রকম কোনো প্রাণী নয়। তাছাড়া এখন এদেশে আইন করে বাছুরহত্যা নিষিদ্ধ। মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা এবং না-ধার্মিক ও অহিন্দু অন্য ধর্মের অনেকেও গোমাংস খান। এ কারণে কিছু গোহত্যা এদেশে হয়ই। আর, হিন্দু-অহিন্দু যেই থাক না কেন সুসিদ্ধ সুপাক গোমাংস কারোরই কোনো ক্ষতি করে না, খেতেও সুস্বাদু। এতে প্রোটিন থাকে শতকরা ২২.৬ ভাগ। (ছাগলের মাংসে ২১.৪ ও মুরগীর মাংসে ২৫.৯ ভাগ।) হিন্দুরা যেমন ছাগল, পাঁঠা বা মুরগীর মাংস খান, মুসলিমরাও তেমনি গরু-ছাগল-মুরগী খান। এইসব ধার্মিক (হিন্দু বা মুসলিম) ঈশ্বরবিশ্বাসীরা যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি (?) ছাগল মুরগীই খেতে পারেন তবে 'তাঁরই' সৃষ্টি গরু বা শুয়োর খেতে আপত্তি কোথায়? আর প্রাণীর প্রতি দরদই যদি প্রধান কারণ হয় তবে শুধু গোহত্যা কেন, শুয়োর-ছাগল-ভেড়া-মুরগী ইত্যাদির হত্যাও কেন নিষিদ্ধ করার আন্দোলন হবে না? এসবের উত্তর খুব একটা কঠিন নয়। ঐ ঈশ্বরের দানের প্রতি বা প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধ— এসব কিছুই ঐ 'মহাত্মাদের' নেই। যেহেতু গরু হিন্দুদের নমস্য এবং বিশেষত যেহেতু মুসলিমরা গোমাংস খান, অতএব যেভাবে হোক গোহত্যা বন্ধের আন্দোলন করে হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে সুড়সুড়ি দিতে হবে, তাদের সংগঠিত করে নিজের জালে আটকাতে হবে (যাতে তারা ভোট দিয়ে গদি দেয় ও হিন্দুরাষ্ট্র গড়া যায়), মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও দ্বেষ ছড়াতে হবে— এই-ই আন্দোলনকারীদের প্রধান লক্ষ্য।

কিন্তু হিন্দুত্ব জিনিসটি যে কী, তা নিয়েই নানা বিতর্ক আছে। এই সব হিন্দুরা যদি বলেন যে, তাঁরা বেদ মানেন না, বৈদিক যুগের মুনিঋষিদের তাঁরা ঘৃণা করেন ও হিন্দুধর্মের শত্রু বলে মনে করেন তবে আলাদা কথা। তা যদি না বলেন, তবে তো এটি সবার জানা যে, ঐ আমলে 'হিন্দুদের' মধ্যে গোমাংস খাওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপারই ছিল। আর এইসব হিন্দুরা যদি বেদ মানতে চান তবে তাঁদের কৃষ্ণযজুর্বেদের মৈত্রায়ণীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত মানব গৃহসূত্রের সেই নির্দেশটিও মানতে হবে, যেখানে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, বাড়িতে অতিথি এলে তাকে গোমাংস দিয়ে আপ্যায়ন করতে হবে এবং সঙ্গে চারজন ব্রাহ্মণকেও আমন্ত্রণ করে গোমাংসে আপ্যায়িত করতে হবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণরাও যে পাত পেড়ে গোমাংস খেত তাতে সন্দেহ নেই।

আসলে মৌলিক ধর্ম বা হিন্দুধর্মের সঙ্গে মূলগতভাবে

গরু বা গোমাংসের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ধর্মের অর্থ বা তাৎপর্য আসলে অন্য যাই হোক না কেন, একটি বিশেষ প্রাণীর মাংস খেলে বা তাকে মারলে ঐ ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে তা আদৌ নয়। ধর্ম যদি এত ঠুনকো হয় তাহলে তাকে নিয়ে কাজ-কারবার করাও মুশকিল। গোমাংস খাওয়া না-খাওয়ার ব্যাপারটি পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মে আরোপিত একটি বাহ্যিক আচার মাত্র। বৈদিক আমলে মুনিঋষি ও সাধারণ মানুষদের দ্বারা ব্যাপকভাবে গোমাংস খাওয়ার কারণে এবং বিশেষত যজ্ঞের বলি হিসেবে গোহত্যা করার জন্য, এক সময় অনুভব করা যায় যে, দেশে গরুর আকাল দেখা দেওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ, একদিকে যেমন ঐ সময় হিন্দুরাই ব্যাপক গোহত্যা করত (তখন কোনো মুসলিমই ছিল না), তেমনি চাষবাসে অত্যবশ্যক ও দুধ-ঘি-মাখনের জোগানদার এই গরুকে নিশ্চিহ্ন হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিতান্তই প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণে গোহত্যা বন্ধের শুভ ও সুস্থ উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অনুভব করেন, শুধু মৌখিক নির্দেশ দিয়ে এ-কাজ করা সম্ভব হবে না। তাই তাকে ধর্মের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করা হল। কৃষিজীবী ঐ সমাজের কাছে হলকর্ষণের একমাত্র বা প্রধানতম উপায় ছিল গরুকে দিয়ে লাঙল করা। সেই গরু যদি না থাকে তবে পুরো অর্থনীতিই ভেঙে পড়বে। তাই গোমাংস খাওয়া তো বটেই, গোহত্যা করাটাকেই একটি চরম ধর্মীয় অনাচার হিসেবে প্রচার করা হল। বেদ উপনিষদে এই ধরনের প্রচার না থাকলেও পরবর্তীকালের প্রচারমূলক ধর্মীয় সাহিত্যে (যেমন পুরাণ ইত্যাদি) এবং সাংবিধানিক রচনায় (যেমন মনুসংহিতা ইত্যাদি) অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে ও গুরুত্বের সঙ্গে এই কাজ করা হল। আর ফলও ফলল অচিরেই। সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক প্রচারের ফলে দু-এক শতাব্দীর মধ্যেই সারা দেশের গরিষ্ঠ অংশ ধর্মভীরু মানুষ গোমাংস খাওয়াকে চরমতম অহিন্দু কাজ ও গোহত্যাকে হিন্দুধর্মবিরোধী হিসেবে বিশ্বাস করে ফেলল। যারা এমন কাজ করে তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করা শুধু নয়, তাদের কঠোর শাস্তিরও ব্যবস্থা হল।

এবং ব্যাপারটি শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দেশ ভারত বলে নয়, গরুনির্ভর কৃষিব্যবস্থার সব দেশেই কমবেশি করা হয়েছে। যেমন চীনে। মাও সে তুং ১৯২৭ সালে হুনানে কৃষক আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্টে জানিয়েছিলেন, 'বলদ কৃষকদের একটি মূল্যবান সম্পদ। ''এ জীবনে বলদ হত্যা করলে পরের জীবনে তুমি বলদ হবে''— কথাটি প্রায় ধর্মীয় অনুশাসনে পরিণত হয়েছে। ...ক্ষমতা অর্জন করবার আগে কৃষকেরা বলদ হত্যার বিরোধিতা করতে কেবল ধর্মীয় অনুশাসনের দোহাই দিতে পারত।... কৃষক সমিতি গড়ে উঠবার পর তাদের ক্ষমতা বিস্তৃত হয়েছে এবং শহরে তারা বলদহত্যা নিষিদ্ধ করেছে।...' গৌতম বুদ্ধ সূত্তনিপাত-এ মন্তব্য করেছিলেন, 'গরু আমাদের বন্ধু, বাবা-মা-আত্মীয়ের মতো, কারণ চাষবাস ওদেরই ওপর নির্ভর করে। তারা খাদ্য, শক্তি, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ ও সুখ প্রদান করে।'

স্পষ্টত, যদি মানুষেরই বাস্তব প্রয়োজন থাকে তবে শুধু গরু কেন অন্য যে-কোনো প্রাণীকেই, হত্যার হাত থেকে রক্ষা মানুষই করে। আর এখন ঐ দু হাজার বছর আগেকার পরিস্থিতি আর নেই। গরু না হলে লাঙ্গল বা চাষবাস হবে না, এখন আর সত্যি নয়। বরং গরু ছাড়া আধুনিক পদ্ধতির লাঙ্গল ও চাষে ফসল উৎপাদন বেশিই করা যায়। দুধ ঘি মাখন ইত্যাদির জন্য পরিকল্পিত গো-পালন ও গো-প্রজনন পশুবিজ্ঞানে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই বিবেচিত হয়। এ অবস্থায় গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে দাঁড়িয়ে লক্ষাধিক হিন্দুর গোরক্ষার জন্য হিংস্র শপথ যেমন হাস্যকর, তেমনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। একে যে কোনোভাবে প্রতিহত করাই শুভবুদ্ধির লক্ষণ। কারণ গো-রক্ষায় এই জঙ্গি আন্দোলন দাঙ্গা ও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস আর বৈরিতাই শুধু সৃষ্টি করবে না, তা একটি অবান্তর যুগানুপযোগী বিষয়ে বিপুল সংখ্যক হিন্দুকে বিভ্রান্তও করবে।

জানুয়ারির পরিকল্পিত গোরক্ষা আন্দোলনের মতো একটি ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলনকে মানুষের শুভবুদ্ধিই প্রতিহত করবে — এ আশা অমূলক নয়। হিন্দুত্ববাদীরা তাদের সর্বনাশা আন্দোলনের রঙ্গভূমিতে গরুর লেজ ধরে উঠে আসতে চাইছে। সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী ব্যক্তি ও রাজনৈতিক কর্মীরা সক্রিয়ভাবে এর আশু মোকাবিলা না করলে বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে মনে হয়।

তথ্যসূত্র:

১. ইন্ডিয়া টুডে, ১৫.১১.৯৫।
২. শরীর ঘিরে সংস্কারগ্রন্থ ভবানীপ্রসাদ সাহু
৩. ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্যগ্রন্থ সুকুমারী ভট্টাচার্য

উৎস মানুষ, জানুয়ারি ১৯৯৬

উমা

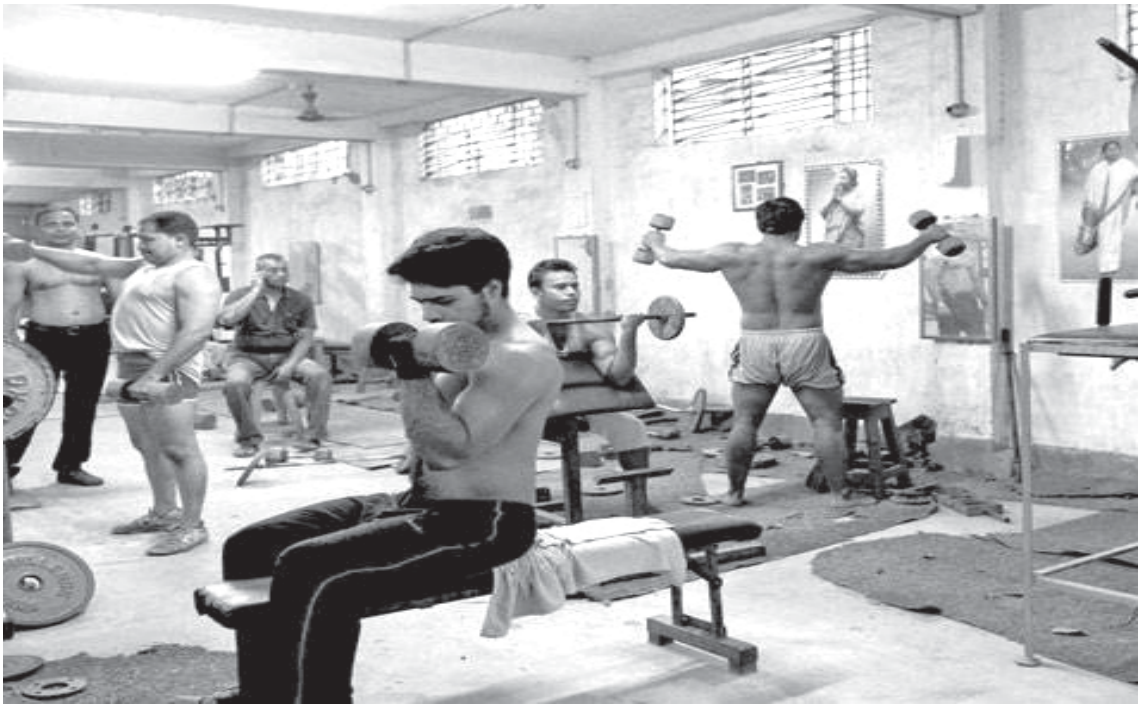

পাড়ার ব্যায়ামাগার থেকে জিমনাসিয়াম

গৌতম মিস্ত্রী

প্রাইমারি স্কুল থেকে সবে বৃত্তি পরীক্ষায় পাস করে উচ্চমাধ্যমিক বা হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছি। আমাদের রিফিউজি কলোনির বাড়ি থেকে স্কুলে যাবার পায়েহাঁটা পথটা বনেদি চ্যাটার্জিপাড়ার মধ্যে দিয়ে গেছে। মায়ের হাত ধরে শৈশবের চেনা গণ্ডির বাইরে সেই প্রথম 'এক্কা-দোক্কা' খেলার বাইরের পৃথিবীতে পদার্পণ। পঞ্চম দিনে চ্যাটার্জিপাড়ার এক মাতব্বর দাদা মাঝপথে মাকে বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গীবিহীন আমার পথচলার সেই সন্ধিক্ষণে শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তরণ ঘটিয়ে দিলেন মাতব্বর দাদা। দেওয়ালবিহীন প্রাইমারি স্কুলের চৌকাঠ ডিঙিয়ে আর কোনো ছাত্র হাই স্কুলে আমার সঙ্গী হতে পারে নি। না, মেধার অভাব নয়, উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পড়ার প্রয়োজন বা বিলাসিতার সৌভাগ্য তাদের ছিল না। ইতিমধ্যে হাই স্কুলে পড়ার সুবাদে পাড়ায় আমার লুকোচুরি, কুমির-ডাঙা আর কাবাডি (আমরা বলতাম হাডু-ডু) খেলার সঙ্গীসাথীদের থেকে মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। এদিকে সেই দাদার মাতব্বরি ওখানেই থেমে রইল না। হঠাৎ একদিন বিকেলে তিনি আমাদের টালির চালের কুঁড়েঘরে এসে হাজির। মায়ের কাছ থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে বনেদি পাড়ায় 'বয়-স্কাউট'-এর দলে ঢুকিয়ে দিলেন। দাদা ছিলেন ওই দলের প্রশিক্ষক। বট-অশ্বত্থ গাছ দিয়ে মোড়া ছয়টি জীর্ণ শিবমন্দিরের লাইনের পাশে এক আধ-বোজা পুকুর। পাশে একফালি মাঠ আর তার সংলগ্ন ব্যায়ামাগার। নতুন স্কুলের অভিজ্ঞতার চেয়েও ব্যায়াম সমিতির পরিবেশ আমাকে এক নতুন স্বাদের বিকেল উপহার দিল। কোনো টাকা পয়সা লাগবে না জেনে বাবা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। এক বিকেলে আসন্ন ক্যাম্পিং-এর জন্য আমরা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে জুতো রাখার র‍্যাক বানানো শিখছি, হঠাৎ চারদিকে হুটোপাটি, ব্যায়ামাগার থেকে সিনিয়র দাদাদের ঝপাং করে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়া, হাসপাতালে ছোটা ইত্যাদি। ছোট ছেলেটি বেঁচে গিয়েছিল। ও পাড়ায় কার বাড়িতে যেন বেড়াতে এসেছিল, সাঁতার জানত না। অথচ গত সপ্তাহে কর্মব্যস্ত দুপুরে, বাস

চলে এমন পাকা রাস্তার ধারে, স্থানীয় পুলিশের থানার নাকের ডগায়, রেলিং-এর বেড়া দেওয়া পুকুরে, শান বাঁধানো ঘাটে জলে ডুবে মারা গেল বেড়াতে আসা এক যুবক। আমাদের বর্তমান বাড়ির পাশের এই পুকুরে প্রতি বছরই এক-আধটা মানুষ জলে ডুবে যায়। আমার ছোটবেলাকার পুকুরে এমন হত না। আমার সেই হাফপ্যান্ট-পরা বয়সে সাঁতার না জানা ছেলেমেয়েদের খুঁজে পাওয়া যেত না। গ্রীষ্মের ধুলোমাখা বা বর্ষার কাদামাখা বিকেলের পরে পুকুরে দাপাদাপির অন্য আকর্ষণ ছিল। সাঁতার শেখার জন্য সুইমিং পুলের প্রয়োজন বা বাবা-মায়েদের মাথা ঘামাতে হত না। সে দিন খুব দূরে হয়ত নেই যখন সাইকেল চালানো শেখার জন্য বা এমনকি ছেলেপিলেকে হাঁটা শেখার জন্য গাঁটের কড়ি খরচ করে পেশাদার লোক নিয়োগ করতে হবে।

এই প্রেক্ষাপট বেশিদিন আগের নয়, যখন পাড়ার উঠতি যুবকদের গুষ্ঠিসুখ উপভোগ করার জন্য লাখ টাকার দুর্গাপুজো বা পৌষমেলার আয়োজনের অজুহাত লাগত না। সরকারি আর্থিক আনুকূল্য বা চাঁদার বই হাতে ভিক্ষাবৃত্তিতে নামতে হত না। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে একটা ফুটবল কিনতে পারলেই বছরভরের বিনোদনের সুবন্দোবস্ত হয়ে যেত। ছেলে আর মেয়েদের জন্য ক্লাব, বয়স্কাউট, আর স্কুলে এনসিসি ছিল। সেখানে ঘাম ঝরিয়ে যৌবনের টগবগে শক্তি যথেষ্ট খরচ না করতে পারলে পাড়ার ব্যায়ামাগার ছিল। ব্যায়ামাগার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত না হলেও বা ব্যায়ামাগারের দেওয়াল জোড়া আয়নায় মাল্টিজিমে ফোলানো হাতের বাইসেপস ও ট্রাইসেপসের গুলি প্রতিফলিত না হলেও সেখানে কেবল পেশির ব্যায়ামই নয়, সুস্থ মনের পুষ্টির হরেক কিসিমের উপাদান থাকত।

ব্যায়ামাগারের ধারণা অবশ্য আমার বাবা-মায়ের কৈশোরের অজ পাড়াগাঁয়েও অজানা ছিল। দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেতে একফসলি ধানচাষের সময়টা বাদ দিলে সারা বছর ছুটে বেড়িয়েও আকাশ ছোঁয়া যেত না। নিছক খেলার অবসর বা প্রয়োজন না হলেও থিতু হয়ে এক জায়গায় বসে থাকার কথা মনে ঠাঁই পেত না। শরীরকে খাটানোর জন্য আলাদা করে ব্যায়ামের ধারণা বা জৈবিক প্রয়োজনও ছিল না। অবস্থাপন্নদের ব্যায়ামের বাই হলে কুস্তির আখড়া আর মুগুর ভাঁজাভাঁজি চলত। প্রথাগত ব্যায়ামের অভাবে শরীরগুলো সাধ-আহ্লাদ পূরণের অনুপযোগী ছিল, এমনটা বলা যাবে না। আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের এক দঙ্গল ছেলে বুড়ো খেয়াঘাটের পারিবারিক নৌকা চেপে যখন আমার মামার বাড়ি যেত, তখন আমার ঠাকুরদাদা একাই অনায়াসে চার-পাঁচ ঘণ্টা বইঠা বাইত।

সভ্যতার অনুষঙ্গ হিসাবে, ঐচ্ছিক শ্রমবিহীন অবসরের সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে গতর খাটানোর প্রয়োজন উপলব্ধি করল বুদ্ধিমান মানুষ। অলস দুপুরে পান চিবিয়ে আর তাস পিটিয়ে কেবল কলেবর বৃদ্ধিই হল তা নয়, সেটা একঘেয়েও মালুম হতে লাগল। ব্যায়ামাগার তাই নিছক শরীরচর্চায় সীমাবদ্ধ থাকল না, সেটা হয়ে উঠল তখনকার জমানার সচ্ছল নায়েব সুবেদারদের বা জমিদারদের ছত্রছায়ায় থাকা মানুষজনের বারোয়ারি চণ্ডীমণ্ডপ বা আড্ডা দেবার রোয়াক। সেখানে রাজনীতি, পরনিন্দা-পরচর্চার আর রসরঙ্গের সাথে সাহিত্যচর্চা আর সামাজিক একাত্মবোধেরও লালন-পালন চলত। শৈশবের খেলার মাঠে কুমির-ডাঙা বা লুকোচুরি খেলায় নিয়ম মানার দায় ছিল না। কৈশোরের ওই ব্যায়ামাগারের বাইরের মাঠে আমরা কচিকাঁচারা লাইন দিয়ে দাঁড়াতে শিখলাম, দড়ির গিঁটের রকমফের শিখলাম আর আগের থেকে জানা থাকলেও কেতাবি ঢঙে গাছে ওঠাও শিখলাম। বৎসরান্তে বয়-স্কাউটের কৌশল প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার ছলে বাড়ি থেকে বেশ দূরের কোনো শিবিরে কেবল নিজের ও সমবয়স্কদের উপর ভরসা করে রাতে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়তাম।

স্বাস্থ্য বাগানোর চেষ্টাটা উন্মুক্ত খেলার মাঠ বা চাষের ক্ষেত থেকে যেদিন ব্যায়ামাগারে ঢুকে পড়ল, সেদিন সঙ্গে করে নিয়ে এল আড্ডা, গল্প, সাহিত্য ও বয়স অনুযায়ী নিছক রঙ্গ-রসিকতার ঝোলাটাও। খেলার মাঠ থেকে সমাজবদ্ধ মানুষ সমাজের খণ্ডচিত্রটা সঙ্গে নিয়েই ব্যায়ামাগারে ঢুকে পড়ল। মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগের সূত্রটা আরও দৃঢ় হল। ব্যায়ামাগারের আয়নায় নিজের হাতের 'গুলি' দেখার চেয়ে সামাজিক যোগাযোগ ও মননশীলের চর্চা বেশি উপভোগ্য হল। নন-ভার্চুয়াল, ধরা-ছোঁয়ার সুযোগওয়ালা এই আড্ডাখানার বন্ধুবান্ধবরা কেবল জলে ডোবা মানুষকে উদ্ধার করতেন কেবল তাই-ই নয়, বিয়ে-শ্রাদ্ধ-মুখেভাতের অনুষ্ঠানে খাবার পরিবেশন করতেন, রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তীতে নাটক মঞ্চস্থ করতেন, দেওয়াল পত্রিকায় লেখা দেবার জন্য তাগাদা দিতেন, পাড়ার কেউ হাসপাতালে ভর্তি হলে সেখানে হাজিরা দিতেন, এমনকি শ্মশানযাত্রায় কাঁধও দিতেন।

আমাদের এই চাহিদাগুলো বিলীন হয়ে যায় নি, হারিয়ে যাওয়া পাড়ার ছেলেছোকরাদের প্রাণকেন্দ্র ব্যায়ামাগারের অভাবে কেবল ওই শূন্যস্থানগুলি বাজারের দখলে চলে গেছে। 'পাড়া' নামের ছবিটা তেত্রিশতলা টাওয়ারগুলোর আকাশছোঁয়া স্পর্ধিত আবাসনের কমিউনিটি সেন্টারে হারিয়ে গেছে। টাওয়ারের পাঁচিলের দেওয়াল যারা টপকে ভিতরে ঢুকতে পারে নি, গায়ে গায়ে গা ঘসা শহরের আর মফস্বলের বাড়িগুলোর বাসিন্দাদের আজকাল চার দেওয়ালের বাইরে খোলা হাওয়ায় দু দণ্ড শ্বাস নেবার জন্য বসার 'রোয়াক'ও মেলে না।

বিত্তবানদের জন্য শীততাপ নিয়ন্ত্রিত তারামার্কা জিমনাসিয়াম আর মধ্যবিত্তদের জন্য মাছের বাজার আর মুদির দোকানের মধ্যে গজিয়ে উঠল 'জিম'। সেখানে ডাক্তারের নির্দেশে অথবা নিজের যৌবনটিকে আঁকড়ে ধরে রাখার প্রয়াসে কসরত চলে। আশেপাশে অচেনা মানুষ ঘাম ঝরায়, দেখা হয়, কথাও হয়ত হয়, অন্তরের যোগাযোগ ঘটে না। এক সপ্তাহ দেখা না হলে খোঁজ নেবার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সেই কৌতূহল ভদ্রতার সীমারেখায় আটকে যায়। সেটা তো আর উদ্বিগ্ন প্রতিবেশীর খবরাখবর নেওয়া নয়, নিছক কৌতূহলই। পরে দেখা হলে 'হেঁ হেঁ, এতদিন দেখা যায় নি যে'— ভাববাচ্যের এই শব্দগুলো আসলে প্রশ্ন নয়; উত্তর দেওয়া বা শোনার বাধ্যবাধকতা নেই। ভার্চুয়াল জগতে বিচরণকারী আধুনিক মানুষ, বাস্তব জগতের অচেনা মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি যোগাযোগের উপায় জানে না, আপন সুখ-দুঃখ আপনার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। আপন অনুভূতি, আকুতি আর উল্লাসের ভার্চুয়াল সংস্করণ ছড়িয়ে দেয় আকাশ বাতাসে, যদি কেউ ক্ষণিকের পছন্দের সঙ্কেত তরঙ্গটি পাঠায়। মানুষটি জিমনাসিয়ামের আয়নায় আবার নিজের ফোলানো বাইসেপস আর ট্রাইসেপস দেখে ধন্য হয়। তেরছা করে দাঁড়িয়ে নিজের হাসিমুখের সেলফি তোলে, ভার্চুয়াল আকাশে ছড়িয়ে দেয়। নতুন পৃথিবীর খেলার মাঠে কৃত্রিম ঘাস (সিনথেটিক টার্ফ) প্রাণবায়ু দেয় না, মাঠের পাশে বট-অশ্বত্থ ছায়া জোগায় না, মাথার ওপর দিয়ে বলাকারা উড়ে যায় না। জিমনাসিয়ামের দেওয়ালজোড়া আয়নায় নিজের সঙ্গেই একমাত্র হাসি-মশকরা, সুখ-দুঃখের কথা বলা যায়। আপন বৃত্তের খোলসের শক্ত দেওয়ালে হৃদ-তরঙ্গ অনুরণনের দোসর খোঁজার বৃথা চেষ্টা করে অকালমৃত্যু বরণ করে।

খেলার মাঠে খেলা আর ব্যায়ামাগারে শরীরচর্চা আসল উদ্দেশ্য ছিল। জিমনাসিয়ামে শরীর চর্চার সঙ্গে জাতে ওঠার একটা আবেদন কাজ করে। শরীরচর্চা কতটুকু হল সেটা টি-শার্টের নিচের ভুঁড়ির নাচন-কোঁদন দেখলে মালুম হয়। আধুনিক জিমনাসিয়ামে আমাদের ব্যস্ত রাখার হরেক কিসিমের বিনোদন মজুত থাকে। ব্র্যান্ডেড শর্টস আর টি-শার্টে শোভিত হয়ে সাদা ধবধবে তোয়ালেটা গর্দানে ঝুলিয়ে মিনারেল ওয়াটারের স্বাস্থ্য পান করে, টেলিভিশনের প্রিয় চ্যানেলটিতে টিউন করে চাড্ডিখানেক সাইকেল চালানো যেতে পারে। তারপর আয়নায় একবার নিজেকে দেখে নেওয়া দস্তুর। মাল্টিজিম নামে একখানা যন্ত্র মাঝখানে খাড়া থাকে। ওটায় অনেকগুলো হাতল ও অদ্ভুত অদ্ভুত সোজা ও ঢালু বসার সিট থাকে। সবগুলোর মাহাত্ম্য বুঝে ওঠার জন্য একটা জীবন যথেষ্ট নয়। এমন সময় আড় চোখে দেখে নিতে দোষ নেই, কেউ আপনাকে লক্ষ্য করছেন কিনা। কেউ দেখছে না এমনটা নিশ্চিত হয়ে দু-একবার কৌতূহল নিরসনের জন্য একবার মাল্টিজিমের দু-একটা হাতল ধরে টেনে দেখা যেতে পারে। ডাম্বেল অঞ্চলটায় প্রথমে একবার হাতের গুলিটা দেখে আন্দাজ করে নিয়ে হরেক ওজনের ডাম্বেলের মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে। এগুলোকে যতটা ভারী মনে হয়, তার চেয়েও ভারী ঠেকে। পা সামলে ডাম্বেল ভাঁজুন যত খুশি, হাত ফসকে মাটিতে পড়লে শব্দ হলে লোকে বড়জোর গাঁইয়া ভাববে, কিন্তু পায়ের আঙুল থেঁতলে যাবে না। জিমনাসিয়ামের এক ধারে অবহেলায় জায়গা জুড়ে পড়ে থাকে ট্রেডমিল আর জগার বা স্টেপার নামে দু ধরনের যন্ত্র। হার্ডকোর ফিটনেস বাতিকগ্রস্ত না হলে কেউ ও ধারটায় যায় না। ওগুলো অ্যারোবিক ব্যায়ামের যন্ত্র। বাড়তি ক্যালোরির বোঝা ঝরানোর জন্য আর হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ সবল রাখার জন্য কেবল ওই দু ধরনের ব্যায়ামের বিকল্প নেই। ঐ ব্যায়ামে খাটুনি আছে, ঘাম ঝরে বিস্তর। সখের ব্যায়ামবীরদের কাছে এই ধরনের ব্যায়াম তাই ব্রাত্য। আবার এমনটাও দেখা গেছে যে, সস্তার জিমনাসিয়ামে প্রয়োজনের তুলনায় কম ট্রেডমিল থাকার জন্য সদস্যদের জন্য ট্রেডমিলের ব্যবহার রেশনিং করা হয়। অথচ ন্যূনতম সুফল পাবার জন্য অন্তত ৩০ মিনিট ধরে ট্রেডমিলে হাঁটতে হবে। দৈনিক ট্রেডমিলে হাঁটার বা ছোটার অভ্যাস আছে এমন মানুষ টানা এক ঘণ্টা হাঁটতে চাইতেই পারে। ছোট জিমনাসিয়ামগুলিতে পর্যাপ্ত সময় ধরে ট্রেডমিল ব্যবহারের বন্দোবস্ত থাকে না।

মানবজীবনের আয়ু সীমিত। তারই মধ্যে আমরা অস্তিত্বের সমর্থন, স্বীকৃতি খুঁজে বেড়াই। আপন অস্তিত্বকে অবিনশ্বর করে রাখার প্রচেষ্টা আমাদের দৈনন্দিনের কর্মকাণ্ডে উৎসাহ আনে, একঘেয়েমির অবসাদ ঘোচায়। ফেলে আসা হারিয়ে যাওয়া পাড়া সংস্কৃতির রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যার সঙ্গে পাড়ার ব্যায়ামাগার আয়োজিত 'দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শনী' মলিন হয়ে যায় অলিম্পিক ও তার নিচের ধাপের বাণিজ্যিক মদতপুষ্ট স্পোর্টস ইভেন্টের সিন্থেটিক ট্র্যাকে। সবাই মিলে সুস্থ-সুন্দর হবার গোষ্ঠীবদ্ধ উদ্যোগ বদলে যায় আশেপাশের মানুষটির সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। এ এক ধরনের অ্যাড্রেনালিন হরমোনের অবাঞ্ছিত অপচয়, আত্মধ্বংসীও বটে। বিশ্বসেরা হতে পারে হাতে গোনা কয়েকটি পেশি গঠনের কারখানায় গড়েপিটে নেওয়া মানুষ, যাঁদের জীবনে অন্য কোনো কাজের দায় নেই। রাস্তাঘাটে, অফিস-কাছারিতে, স্কুলে-কলেজে, দোকান-বাজারে, কলকারখানায় আর ক্ষেতখামারে আমাদের যে অবতারদের নিয়ে আমাদের নিত্য ওঠাবসা, তাদের জন্য কিছু সামাজিক উৎসাহ আর স্বীকৃতির আঙিনার প্রয়োজন থেকে যায়। গাজনের মেলায় লাঠিখেলা আর হ্যাজাগের আলোয় পাড়ার ব্যায়ামাগারের ব্যবস্থাপনায় দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শনীতে দাঁত দিয়ে লোহার পাত বাঁকানো, ভারোত্তোলকদের ওজন তোলা, জ্বলন্ত রিঙের ভেতর দিয়ে গলে যাওয়া, জিমনাস্টিক আর্চ, ভোল্ট, পিকক, সামারসল্ট, নমনীয় শরীরের নানা কসরত কৈশোরের প্রয়োজনীয় উত্তেজনা জোগাত, উঠতি কচিকাঁচাদের স্বপ্নের জোগান দিত, আর বয়স্কদের নিজেদের বিগত যৌবনের হীরের ঝলকানির আভাস দিত। সর্বোপরি এইসব ব্যায়ামাগারগুলি সমাজের রোয়াকে ব্যয় করা কর্মহীন অলস সময়ের কুচিন্তার 'শোধনযন্ত্র' হিসেবে কাজ করত। বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে কলেজ স্কোয়্যারের পাশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যায়ামাগার ছিল (এখন আছে কি না জানি না), যেখানে নগণ্য সদস্য-চাঁদায় ব্যায়ামের সুবন্দোবস্ত ছিল। এখন এই ধরনের ব্যায়ামাগারগুলো কৌলীন্য হারিয়ে ইতিহাসে বিলীন হওয়ার বা ব্যবসায়িক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মাল্টিজিমের মালিকের কাছে বিক্রিত হবার অপেক্ষায়।

অনেকেরই ধারণা ছিল বা এখনো আছে ব্যায়াম করলে পেশির সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও বুঝি মোটা হয়ে যায়। এমন ভাবনার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কিংবদন্তী হিসাবে মহম্মদ আলির কথা উল্লেখ করা যেতেই পারে। অমন স্থিরপ্রতিজ্ঞ, অন্যায়ে আপস-না-করা আর নিজের অর্জিত প্রতিষ্ঠাকে বাজি রেখে সুস্থ মনের পরিচয় দেওয়া মানুষকে মাথামোটা ভাবার মতো মোটা মাথার মানুষ নিশ্চয়ই লিটল ম্যাগাজিন পড়েন না।

একবার এইরকম এক পাড়ার ব্যায়ামাগার আয়োজিত এক শৈলারোহণ শিবিরে বাঁকুড়ার শুশুনিয়ায় গিয়েছি। সূর্য ওঠার আগে খোলা মাঠের নির্ধারিত স্থানে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে কাঁচা মাটির গ্রামের রাস্তায় ঘণ্টাখানেক দৌড়ে এসে তখন পেটে রাক্ষসের খিদে। ব্যায়ামের মাস্টার অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি ভরে কাঁচা ছোলা-বাদাম আর আদার কুঁচি মাঝমাঠে রেখে পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমাদের জনা-পঞ্চাশের বাহিনী চারদিক থেকে ডেকচির মধ্যে থাবা মারার প্রচেষ্টায় নিমেষে ডেকচি উল্টে সারা মাঠে ছোলা-বাদাম ছড়িয়ে পড়ল। কেবল গুটিকতক ছেলের মুখে ধুলোমাখা ছোলা-বাদাম। পরদিন সকালে লাইন দিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে খাবার ভাগ করে খাওয়া শেখাতে হয় নি ব্যায়ামের মাস্টারকে। বর্তমান কালের জিমনাসিয়ামে অঙ্কুরিত ছোলা-বাদাম মেলে না, মেলে নামীদামী ব্র্যান্ডের প্যাকেজের গোপন ফরমুলার কৌটোভর্তি প্রোটিন পাউডার, ডায়েট কোক, বোতল ভর্তি আসলি হিমালয়ান মিনারেল ওয়াটার। কেবল স্টারমার্কা জিমনাসিয়ামে যাবার রেস্ত জোগাড় করলেই হয় না, পকেটে থাকতে হবে ডায়েটিসিয়ানের ফিজ। তেনারা হিসাব কষে কেবল আপনার জন্য বিশেষ করে বানিয়ে দিতে পারেন আপনার দেহসৌষ্ঠব বৃদ্ধির উপযুক্ত ম্যাজিক পোসন। সেই 'আধুনিক জড়িবুটি' আপনি আবার পাড়ার মুদি বা মনিহারি দোকানে পাবেন না, জিমনাসিয়াম থেকে কিনে নেওয়ার উপযুক্ত বাতাবরণ তৈরি করা হয় সুচতুরভাবে।

শরীরচর্চা করে আমরা যে সচরাচর উপকারগুলো আশা করি তার মধ্যে সবথেকে আবেদনময় হল সুঠাম ও আকর্ষণীয় দেহের অধিকারী হওয়া। শহরের বিত্তবানদের সেই প্রয়োজন মেটাতে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত দামি পরিষেবামূল্যের জিমনাসিয়াম বা হাই প্রোফাইল ক্লাবের অভাব নেই। জিমনাসিয়াম সংস্কৃতিতে আকর্ষণীয় দেহ প্রাপ্তি হলেও তাতে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে অধিক প্রয়োজনীয় নীরোগ ও দীর্ঘজীবন নিশ্চিত হয় না। কেবল পেশি ফোলানোর ব্যায়াম করলে সেটা কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি করে না। অর্থাৎ সবাই একই উদ্দেশ্যে ব্যায়াম করেন না, তাই একই ব্যায়াম সবার জন্য ঠিক নয়। একজন বডি-বিল্ডার

বা একজন অ্যাকশন ফিল্মের হিরো যে উদ্দেশ্যে শরীরচর্চা করেন, একজন হৃদরোগী হরিপদ কেরানি সে উদ্দেশ্যে সেটা করেন না। এবং বলাই বাহুল্য, উদ্দেশ্য আলাদা হলে ব্যায়াম বদলাবে। এখানে আমরা ঋত্বিক রোশনের চাইতে হরিপদ কেরানিকে বেশি গুরুত্ব দেব। কিন্তু তার আগে বলে রাখি, আমাদের কালচারটা এমন যে টিভিতে বা নানা ম্যাগাজিনে অ্যাকশন ফিল্মের হিরো বা অতি তন্বী হিরোইন কী করে হওয়া যায় তার টিপস সহজপ্রাপ্য, কিন্তু সুস্থ সবল জীবনের জন্য কী করবেন, সেটা নিয়ে লেখা-বলা বড় কম। সেরকম লেখা যদিবা পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রায়শই বিজ্ঞানের বদলে অপ্রমাণিত আপ্তবাক্যের ছড়াছড়ি — 'তিন পা হাঁটলেই সুস্থ' ধরনের পাঠকতোষ লেখা। আমাদের শরীরচর্চার উদ্দেশ্য হল— নীরোগ, সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকা। আর যদি রোগ হয়েই থাকে তো সেই রোগের প্রকোপ কমানো, আর যতটা সম্ভব কর্মক্ষম থাকা। এই উদ্দেশ্যে দৌড়ঝাঁপের অ্যারোবিক শরীরচর্চা করলে মেদবৃদ্ধি হবে না, বাড়তি মেদ ঝরবে, সুতরাং আপনা থেকেই দেহ সুগঠিত হবে। তবে দারা সিং বা জনি ওয়েসমুলার হবার কোনও সম্ভাবনা নেই।

দর্শনভেদে যৌবনের মাপকাঠি ভিন্ন। নিজের শরীর অন্যের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার চেয়েও দীর্ঘ রোগমুক্ত ও কর্মক্ষম জীবন 'নিজের কাছে' প্রাধান্য পাওয়া উচিত বলেই মনে হয়। আশার কথা, এই দুই দৃষ্টিকোণ থেকে যৌবনের অমৃতসুধা বা ব্যায়ামের পদ্ধতির তফাত নেই, তফাত আছে সেগুলোর অগ্রাধিকারে ও প্রাধান্যে। নিজের জন্য বাঁচার প্রয়োজনের ব্যায়ামে আমাদের আকর্ষণীয় শরীরের চেয়ে কর্মক্ষম শরীর গুরুত্ব পায়। কর্মক্ষমতা বা চলতি কথায় 'দম' নির্ভর করে আপনার হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও রক্তনালীর সঙ্ঘবদ্ধ ক্রিয়া পেশিতে একক সময়ে কত বেশি অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ করতে পারে আর পেশি ওই রক্ত থেকে কত বেশি পরিমাণে অক্সিজেন নিষ্কাশন করতে পারে তার ওপর। শারীরিক দক্ষতার এই ঊর্ধ্বসীমাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'ভি-ও-টু ম্যাক্স' বলে।

যে কথা দিয়ে নিবন্ধটি শুরু করেছিলাম, খেলার মাঠ আর ব্যায়ামাগার শরীরচর্চার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগের মঞ্চ উপহার দেয়। আধুনিক যুগের জিমনাসিয়াম বা পাঁচতারা ক্লাব হাউস নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিনোদনের ও কিঞ্চিৎ পেশিগঠনের ব্যবসায়িক সংস্থা মাত্র। আখের রস ছেঁকে শোধন করে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সাদা ধবধবে চিনি তৈরি করা হয়। তবুও আখের রস আর চিনি গোলা জলের মধ্যে একটা মোটা দাগের পার্থক্য থেকেই যায়, তা সেই চিনির সরবত কোক বা পেপসির বোতলের মধ্যে যতই ভরা হোক না কেন। ব্যায়ামাগার যদি আখের রস হয়, জিমনাসিয়াম তবে কোক বা পেপসির বোতল। **উ মা**

প্রতিবেদন

'পরিবেশকর্মীদের যৌথ উদ্যোগ' গত ১১ জুন পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বাঁচাতে একটি প্রচার অভিযানের আয়োজন করে। এদের হাতিয়ার ছিল পোস্টার – তাতে লেখা ছিল 'এই এলাকা পূর্ব কলকাতা জলাভূমির অন্তর্গত', 'এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের আইনে সংরক্ষিত', 'এখানে জলাভূমি বুজিয়ে নির্মাণ ও জমির চরিত্র বদল বে-আইনি।' প্রায় ১২৫ বর্গ কিমি জুড়ে এই জলাভূমির ওপর নির্ভরশীল কয়েক হাজার কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী। কোনোভাবেই এই জলাভূমির চরিত্র বদল করা যাবে না বলে আদালতের যে নির্দেশ আছে তাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে যেসব নির্মাণ কাজ চলছে তা বন্ধ করতে এই প্রচার আন্দোলন। পরিবেশবিদ শ্রী ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ, যিনি পূর্ব কলকাতা জলাভূমিকে 'রামসার' অন্তর্ভুক্তিকরণের অন্যতম কারিগর, জানালেন এ ধরনের প্রচারের ফলে এলাকার মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। গত ৩ মার্চ ২০১৭ রামসার সম্পাদকমণ্ডলীর পরামর্শদাতা লিউ ইয়ং রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেন যে পূর্ব কলকাতা জলাভূমিকে চিহ্নিত করে চারদিকে সাইনবোর্ড লাগানো দরকার। তিনি এই জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য একটি পরিচালন পর্ষদ গঠন করার কথাও বলেন। এ রাজ্যের পরিবেশমন্ত্রী শ্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে জলাভূমি ঘিরে সাইনবোর্ড লাগানো হবে। এলাকার বহু মানুষ এই জলাভূমি বাঁচাবার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দেন। পরিবেশকর্মীদের যৌথ উদ্যোগের পক্ষে শ্রী শান্তনু চক্রবর্তী জানান যে এই জলাভূমিতে যে কোনো বে-আইনি নির্মাণ হলে এলাকার মানুষই তাদের খবর দেন। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ যে রাজ্যের পরিবেশমন্ত্রীর আদেশ অমান্য করে একের পর এক ভেড়ি বুজিয়ে নির্মাণ কাজ চলছে। প্রচার আন্দোলনে এসে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী সুকান্ত চৌধুরী অংশ নেন। তাঁর প্রশ্ন 'সল্ট লেকে খালি জমি পড়ে থাকলে যদি সরকারি নোটিশ ঝুলতে পারে তাহলে এরকম গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমির চারদিকে নোটিশ ঝোলানোয় সরকারের কোথায় আটকাচ্ছে?' পরিবেশকর্মীদের দাবি জলাভূমির ভেতর দিয়ে উড়ালপুল ও রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা ত্যাগ করা উচিত।

সংবাদ সূত্র ঃ দ্য টেলিগ্রাফ, ১২ জুন ২০১৭

ছোটদের সঙ্গে বড়দের মেলামেশা চালু অভ্যেসটার গোড়ায় গলদ

অরুণালোক ভট্টাচার্য্য

ছোট এবং বড় বলতে যেমন বয়সের ফারাক বোঝায়, ঠিক সেরকমভাবেই মননেরও একটা পার্থক্য থেকে যায়। গঠনগত দিক থেকে মস্তিষ্ক বা মগজের সলতে পাকানো এবং কার্যকারিতা শুরু হয়ে যায় শিশুর জঠরাবস্থা থেকেই। মোটামুটিভাবে মস্তিষ্কের সিংহভাগই তৈরি হয়ে যায় পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই। সে তো হল তার গঠনগত দিক। তার আয়তন, তার ওজন— এগুলোর পরিমাপ আমরা করে ফেলতেই পারি, কিন্তু মননের পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এই মনন বা ইন্টেলিজেন্সের জন্য যেমন মস্তিষ্কের গঠনগত ত্রুটি থাকলে চলবে না, ঠিক সেরকমই আরো দুটি জিনিসের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। প্রথম জিন--- যা শিশুটি উত্তরাধিকারসূত্রে পাবে আর দ্বিতীয়ত বাহ্যিক উদ্দীপনা বা স্টিমুলাস। গঠনগতভাবে বা জিনের প্রভাব নিয়ে আমাদের মানে বড়দের খুব করণীয় কিছু নেই। কিন্তু বাহ্যিক স্টিমুলাস অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয় বড়দের আচার-আচরণ এবং মেলামেশার দ্বারা।

এবারে আমরা কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করব। একটি শিশু, যে ছোটবেলায় অন্যান্য শিশুদের তুলনায় একটু বেশিই কান্নাকাটি করে, সেটা হয়ত তার স্বাভাবিক আচরণ। ডাক্তারবাবু বলেছেন শিশুটি খিদের জন্য কান্নাকাটি করছে। উদ্বিগ্ন হয়ে প্রত্যেকবারই শিশুটির মুখে হয় দুধভর্তি বোতল বা মিছরির জল বা চুষনি গুঁজে শিশুটিকে চুপ করানোর চেষ্টা করা হয়। তাতে সাময়িকভাবে শিশুটি হয়ত শান্ত হয়ে যায়। ক্রমাগত এই ধরনের ব্যবহারে শিশুটির মস্তিষ্কে এইরকম সঙ্কেত পৌঁছয় যে, মানসিক বা শারীরিক কষ্টের সময়ে কিছু মুখে দিলে বা আঙুল চুষলে স্বস্তি মিলতে পারে। ফলে শিশুটির অনেক বয়স পর্যন্ত আঙুল চোষার বদভ্যাস থেকেই যায়। এর ফলে তার দাঁতের সারিগুলি অবিন্যস্ত হয়ে যায়। মানসিক চাপ কাটানোর জন্য যখন-তখন খাওয়ার বদভ্যাস গড়ে ওঠে। শিশুটির ওজন বেড়ে যায়, দেখা দেয় স্থূলতা এবং তার সঙ্গে আরও আনুষঙ্গিক সমস্যা যেমন— ডায়াবেটিস, লিপিড-এর গণ্ডগোল। এত সব ঝামেলার সূত্রপাত কিন্তু শিশুর প্রতি বাড়ির বড়দের কিছু ধারণা এবং তার ভুল ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য।

এবার সেই ছেলেটির কথা বলব যাকে স্কুলে সবাই বলে ক্ষ্যাপা-দাদু। অঙ্ক কষতে কষতে ছেলেটির মনে হয় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ সব চোখের সামনে দিয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে যাচ্ছে। লিখতে গিয়ে ড, ত, উ, ভ সব একাকার হয়ে যায়। dear লিখতে গিয়ে bear লিখে ফেলা বা their আর there গুলিয়ে ফেলা তো তার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। ফলস্বরূপ ক্লাসে জোটে শিক্ষকদের উপহাস। বন্ধুরা টিটকিরি দেয়। ছেলেটি ভেতরে ভেতরে আরও গুটিয়ে যায়। ক্লাসের রেজাল্ট উত্তরোত্তর খারাপ হতে থাকে। অভিভাবকরাও শিক্ষকদের থেকে ক্রমাগত অভিযোগ শুনতে শুনতে ছেলেটির ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। অথচ এই ছেলেটিই গানের ক্লাসে একদম অন্যরকম। গানের কথা, সুর, তাল, লয় একদম যেন মনের মধ্যে গেঁথে যায়। সেখানে কোনওরকম ভুলচুক নেই। তাই রবীন্দ্রজয়ন্তী বা শিক্ষক দিবসে মূল গায়েন কিন্তু এই ছেলেটিই। তার মানে এই ছেলেটির বুদ্ধিতে কোনও ঘাটতি নেই। ঘাটতিটা অনুধাবনের। পরিভাষায় যাকে বলে ডিসলেক্সিয়া। বিশেষ এক ধরনের প্রশিক্ষণের সাহায্যে খুব সহজেই এইসব শিশুদের রোগমুক্তি ঘটতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা না বুঝে বড়রা যদি ক্রমাগত নেতিবাচক মনোভাব দেখাতে থাকেন, ছেলেটি আস্তে আস্তে মানসিকভাবে গুটিয়ে যাবে এবং সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এই ডিসলেক্সিয়া নিয়ে ২০০৭ সালে যে হিন্দি সিনেমাটি অসাধারণ মুনশিয়ানায় তৈরি হয়েছিল, তার নাম, 'তারে জমিন পর'। বাণিজ্যিক সিনেমা হয়েও যেভাবে ডিসলেক্সিয়া নিয়ে একটা ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, তা এক কথায় অভূতপূর্ব।

সময় পাল্টাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ এবং আমাদের পরিবেশটাও। শিশুদের শৈশব, কৈশোর এবং বয়ঃসন্ধি— এই তিনটি অতি সংবেদনসীল সময়ে বাড়ির বড়দের যে চালু অভ্যেস সেটা যদি সময়োপযোগী না হয়, তাহলেই কিন্তু বিস্তর সমস্যা। চোটদের একটা নিজস্ব চিন্তার জগৎ আছে। কখনও সে নিজেকে 'বীরপুরুষ' মনে করে, মায়ের রক্ষাকর্তা। কখনও যে 'মাস্টারমশাই' সেজে পোষা বেড়ালটিকে নিজের বুলি শেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দুটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই যে শিশুমনে নিজের যে প্রতিচ্ছবিটি সে লালন করে, সেটি কিন্তু বয়স্ক কোনও চরিত্রের — মোটেই শিশুসুলভ নয়। যার জন্য শিশুদের সঙ্গে মেলামেশাটা কিন্তু খুব স্বাভাবিক হওয়া উচিত। আর পাঁচজন মানুষের সঙ্গে আমরা যেমন মেলামেশা করি, শিশুদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একইরকম। শুধু আচরণটি হতে হবে নরম, কোমল এবং বিনীত।

আসুন এবারে একটু রোহনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি। রোহনের দু বছর বয়স হতে চলল। এখনও কথা বলতে শেখে নি। রোহনের ডাক্তারবাবু বহুদিন থেকেই বলে চলেছেন যে, একটা পরীক্ষা করে দেখে নেওয়ার দরকার যে, সে কানে শুনতে পায় কি না। রোহনের বাড়ির লোকের তাতে ঘোর অনীহা। তাঁদের বক্তব্য হল, এ বাড়ির সবাই নাকি দেরিতে কথা বলতে শিখেছে। আর তাছাড়া রোহন যে শুনতে পায় তার প্রমাণ হল টিভির আওয়াজ শুনলেই সে দৌড়ে টিভির ঘরে চলে আসে। আরও মাস ছয়েক পরে, রোহন যখন তখনও কথা বলতে পারছে না, খানিকটা নিমরাজি হয়েই বাড়ির লোকজন শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরীক্ষাটা করিয়েই ফেললেন। তাতে দেখা গেল রোহন জন্ম থেকেই কানে কম শোনে। প্রশ্ন হল, তাহলে সে টিভির আওয়াজ শুনল কী করে? রোহন এক্ষেত্রে শব্দ শুনেছে ঠিকই, কিন্তু শ্রবণশক্তি কম হওয়ার জন্য শব্দের গুণগত মান বিচার করার ক্ষমতা তার মস্তিষ্কের নেই। রোহনের মস্তিষ্ক জন্মের প্রথম আড়াই বছর শব্দের স্টিমুলাস থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য, তার কথা বলার প্রক্রিয়াও দেরিতে শুরু হল। সেইজন্যই অনেক দেশেই সদ্যোজাত শিশুদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরীক্ষা করানো হয়। আমাদের দেশেও কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন যেসব শিশু সময়ের অনেক আগে জন্মাচ্ছে বা যাদের জন্মের পরে বেশি জন্ডিস হয়েছে বা যেসব শিশু মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়েছে তাদের নিয়ম করে শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরীক্ষা করানো হয়।

এইবার রোহনের মতোই আরেকটি খুব ছটফটে শিশুর কথা বলব যে দু বছর বয়সে কথা বলতে শেখে নি। কিন্তু তার শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরীক্ষায় কোনওরকম গণ্ডগোল নেই। কিন্তু ঐ যে বলছিলাম না খুব ছটফটে, এক জায়গায় চুপ করে দু দণ্ড বসে না। ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিলেন শিশু-মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দেখাতে। বাড়ির বড়রা বললেন, কানে শোনার যখন অসুবিধা নেই, তখন কয়েকটা দিন অপেক্ষা করা যেতেই পারে। আধুনিক রীতি মেনে শিশুটি একটি নার্সারি স্কুলেও ভর্তি হয়ে গেল। কিছুদিন পরে স্কুলের দিদিমণি অভিযোগ করলেন, সে সকলের সঙ্গে মিশতে চায় না, একলা একলা নিজের মনে খেলা করতে পছন্দ করে। বছরখানেকের মধ্যেও শিশুটির মুখে বোধগম্য কোনও বুলি ফুটল না। সাড়ে তিন বছরে, শেষ পর্যন্ত যখন মনোরোগ বিশেষজ্ঞর কাছে যাওয়া হল তখন বোঝা গেল শিশুটি অটিস্টিক। অটিজম-এর যেহেতু কোনো ওষুধ হয় না, এদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ-এর ব্যবস্থা আছে। যত তাড়াতাড়ি এই প্রশিক্ষণ শুরু করা যায়, তত ভাল ফলাফল আমরা আশা করতে পারি। অটিজিম-এর অনেক ভাগ আছে। সেইরকমই একটি হল, হাই ফাংশানিং অটিজম। ১৯৮৮ সালে ডাস্টিন হফম্যান অভিনীত এইরকমই এক চরিত্র নিয়ে অস্কার পুরস্কার পাওয়া একটি অসাধারণ সিনেমা তৈরি হল নাম — রেইনম্যান। ভারতেও এইরকম এক চরিত্র নিয়ে ২০১০ সালে শাহরুখ খান অভিনীত যে ছবিটি নির্মিত হল, তার নাম — মাই নেম ইজ খান। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, দেরিতে হলেও আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে শিশুদের আচরণগত সমস্যা বা মানসিক রোগ নিয়ে সচেতনতা বাড়ছে।

সময় পাল্টাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ এবং আমাদের পরিবেশটাও। শিশুদের শৈশব, কৈশোর এবং বয়ঃসন্ধি— এই তিনটি অতি সংবেদনশীল সময়ে বাড়ির বড়দের যে চালু অভ্যেস সেটা যদি সময়োপযোগী না হয়, তাহলেই কিন্তু বিস্তর সমস্যা। ছোটদের একটা নিজস্ব চিন্তার জগৎ আছে। কখনও সে নিজেকে 'বীরপুরুষ' মনে করে, মায়ের রক্ষাকর্তা। কখনও যে 'মাস্টারমশাই' সেজে পোষা বেড়ালটিকে নিজের বুলি শেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দুটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই যে শিশুমনে নিজের যে প্রতিচ্ছবিটি সে লালন করে, সেটি কিন্তু বয়স্ক কোনও চরিত্রের— মোটেই শিশুসুলভ নয়। যার জন্য শিশুদের সঙ্গে মেলামেশাটা কিন্তু খুব স্বাভাবিক হওয়া উচিত। আর পাঁচজন মানুষের সঙ্গে আমরা যেমন মেলামেশা করি, শিশুদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একইরকম। শুধু আচরণটি হতে হবে নরম, কোমল এবং বিনীত। সত্যজিৎ রায় নিজে শিশুদের সঙ্গে এইভাবে মিশে যেতে পারতেন বলেই তাঁর সিনেমায় শিশুদের চরিত্রগুলো অত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। পথের পাঁচালী-র অপু-দুর্গা, সোনার কেল্লা-র মুকুল, পিকু-র পিকু বা জয় বাবা ফেলুনাথ-এর রুকু— সবাই কিন্তু অভিনয়ে সমান সাবলীল। ভেবে দেখুন, বিভিন্ন রকম চরিত্রে, সে শহর হোক বা গ্রাম যেখানকারই হোক না কেন— শিশুদের অভিনয় কিন্তু প্রায় ত্রুটিহীন। এই প্রসঙ্গে সোনার কেল্লা-র মুকুল চরিত্রে অভিনীত কুশল চক্রবর্তী কী বলেছেন একটু দেখে নেব— 'তাঁর বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি কখনই আমাদের সঙ্গে শিশুদের মতো আচরণ করেন নি। আমি তাঁর সঙ্গে দাবা খেলতাম এবং আমি প্রত্যেকবারই জিতে যেতাম। সম্ভবত তিনি আমাকে জিততে দিতেন। শিশুদের একই আসনে বসিয়ে এই যে মিশে যাওয়া, এতে আমরাও স্বচ্ছন্দ বোধ করতাম। এই পরিবেশে, আমাদের অভিনয় আমাদের ব্যবহারের মতই স্বাভাবিক হয়ে উঠত। সেটিকে কখনই কঠিন বলে মনে হত না।'

সোনার কেল্লার শুটিং-এর সময় একদিন ইউনিট-এর সদস্যরা হোটেলে ফিরছে। কুশল চক্রবর্তীর হঠাৎ প্রশ্ন 'আচ্ছা আকাশ কেন নীল'! ক্লান্ত বিধ্বস্ত কলাকুশলীরা জবাব দেবার মত অবস্থায় নেই। আর ইউনিট-এর যে মানুষটি মানে ছবির পরিচালক সত্যজিত রায় কিন্তু একটুও বিরক্ত হলেন না। খুব সহজ ও সুন্দরভাবে কুশলের প্রশ্নের জবাব দিলেন। এ ঘটনা থেকে ন্যূনতম শিক্ষা কি আমরা মানে বড়রা নিতে পারি না! (অগ্রপথিকেরা– সৌমিত্র চ্যাটার্জী)

শিশুদের মনের একটা নিজস্ব জগৎ আছে। বড়রা যদি সেটা অনুধাবন করে শিশুদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, সেটা শিশুদের মানসিক গঠনে অনেকটাই সাহায্য করে। শিশুটি কী ভাবছে, সেটা চিন্তা না করে, আমরা আমাদের ভাবনাটা শিশুদের ওপরে চাপিয়ে দিই। এই প্রসঙ্গে অঞ্জন দত্তের লেখা 'ক্যালসিয়াম' গানটির কথা উল্লেখ না করে পারছি না। সেখানে কাকা, পিসি, জ্যাঠা, আন্টি, পাড়ার মাসিমা, দাদু সবাই নিজের মতামত দিয়ে চলে বাড়ির ছোটটির ব্যাপারে। সাফল্যে যেমন উৎসাহ দেওয়াটা জরুরি, ঠিক সেইরকমই ব্যর্থতাকেও খুব সহজভাবে গ্রহণ করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ তো কবেই বলে গেছেন— 'সত্যেরে লও সহজে'। 'তোর দ্বারা কিস্যু হবে না' জাতীয় নেতিবাচক মন্তব্য শিশুমনে সুদূরপ্রসারী এক প্রভাব ফেলে, যা শিশুমনের গড়ে ওঠার পরিপন্থী। বাড়িতে এমন কোনো অবাস্তব পরিবেশের সৃষ্টি করা চলবে না, যাতে শিশুটি এক ফ্যান্টাসির আবহে বা ভয়ের পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে। 'তোমার পূর্বপুরুষ অমুক ছিলেন' বা 'তমুকের রক্ত তোমার শরীরে'— এই জাতীয় মন্তব্য শিশুকে বর্তমান বাস্তব জগৎ থেকে এক অলীক জগতে নিয়ে যায়। মিথ্যে শ্লাঘা নিয়ে বড় হয়ে ওঠা শিশুটির মনন বারংবার ধাক্কা খায় কঠিন বাস্তবের সঙ্গে। 'তোমার কাজ পড়াশোনা করা, বাজার করে সময় নষ্ট করতে হবে না' জাতীয় উপদেশ শিশুটিকে হয়ত বইয়ের পোকা করে তোলে। স্কুল পেরিয়ে যখন সে কলেজে ঢোকে বা সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করে, তখন বহির্বিশ্বের জটিলতায় সে হয়ে পড়ে দিশাহারা। তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ভয়ানক কঠিন হয়ে পড়ে। কথায় বলে, 'আপনি আচরি ধর্ম, অপরে শিখাও'। বাড়িতে বড়রা, মানে এখনকার ছোট সংসারে বাবা-মায়ের আচার-ব্যবহার ছোটদের ব্যবহারিক জীবনেও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। শিশুটি ছোটবেলা থেকে বাবা-মাকে ঝগড়া করতে দেখে বা উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতে দেখে, তার কাছ থেকে ভবিষ্যৎ জীবনে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন কি আমরা আদৌ আশা করতে পারি? এখন তো আবার ছোট পরিবার। প্রত্যাশার চাপ আরও বেশি। সমাজ এবং পরিবেশও পাল্টে যাচ্ছে। সব সামলে আমরা বড়রা যদি ছোটদের প্রতি নিজেদের ব্যবহার সঠিক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ না রাখি, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে দায়িত্বহীনতার জবাবদিহি করতে হতেই পারে।

উমা

আমেরিকায় সংবাদপত্র কমে আসছে এ দেশেও কী হবে, কী হওয়া বিধেয়?

রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য

রামমোহন তখন 'মীরাত-উল-আখবার' নামের এক ফার্সি কাগজ বের করতেন। ১৮২৩ সাল। সাত বছর আগে কলকাতায় এসেছেন। তাঁকে ঘিরে বিদ্বান বাঙালিদের প্রথম সঙ্ঘটি গড়ে উঠছে। গভর্নর জেনারেল অ্যাডাম ভারতের শিশু কাগজগুলোকে বাগে রাখতে এক দমনমূলক আদেশ জারি করলেন। প্রতিবাদে উঠিয়ে দিলেন রামমোহন তাঁর কাগজ। কলকাতায় বন্ধুদের নিয়ে করলেন সুপ্রিম কোর্টে মামলা। পরে বিলাতের রাজা চতুর্থ জর্জকে চিঠি লিখলেন যে– ঐ আদেশ '...calculated to suppress truth, probate abuses and encourage oppression ...'। এ কয়েকটা শব্দ এ আলোচনায় খুব কাজে লাগবে। আজকাল দেশে অনেক খবরের কাগজ। সংবিধান ও সুপ্রিম কোর্টের কল্যাণে রামমোহনের সময়ের তুলনায় তাঁদের অবাধ স্বাধীনতা। তবুও ঐ শব্দগুলো এখনো আমাদের দরকার।

শশী থারুর দিন কয়েক আগে (২২.৫.১৭) জাপান টাইমসে এক কলামে লিখেছেন যে আমেরিকা, ব্রিটেন ও জার্মানিতে টিভি-ট্যাবলেট-মোবাইলের ঠ্যালায় কাগজগুলোর বিক্রি কমেছে ৩ থেকে ১২ শতাংশ। তবে ভারতে এখন কাগজের সার্কুলেশন বাড়ছে। খবরের কাগজ এদেশে মোটেই পতনশীল নয় বরং এক জমজমাট ব্যবসা। ২০১৩ সালে ভারতে ছিল ৫৭৬৭টি কেনাবেচার কাগজ, ২০১৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৭৮৭১টি। এদিকে পাঠক বাড়ছে, তো ওদিকে বিজ্ঞাপন। ২০০৬ সালে 'অডিট ব্যুরো অফ সারকুলেশন'-এর হিসেবে ভারতে খবরের কাগজের বিক্রি ছিল ৩.৯ কোটি, ২০১৬ সালে সেটা ৬০ ভাগ বেড়ে হয়েছে ৬.২ কোটি। টিভি এখানেও কনুই দিয়ে ঠেলছে। তবে থারুর বলছেন নতুন আখরিয়ারা, মানে নবসাক্ষর, বিশেষ করে উত্তর ভারতীয়রা ঝাঁপিয়ে পড়ে কাগজ কিনছেন, আর দেশে প্রগতিও হয়েছে, তাতেই কাগজ বেশি বিকোচ্ছে। প্রগতির অনুভূতিটা না তথ্যে না চোখে কোনোভাবেই আমাদের হয় না। কী আর করা যাবে! তবে এ কথা ঠিক যে উত্তরপ্রদেশের লেখাপড়ার হার বেড়েছে। ২০০৬ সালে সেখানে ১০ বছরের বেশি দিন স্কুলে যাওয়া মেয়ে (১৫-৪৯) ছিল মাত্র ১৮.৩ শতাংশ, এখন (২০১৬) হয়েছে ৩২.৯ (NFHS-4)। এ উত্থান থেকে কিছু কাগজপড়ুয়া তো হবেই। তবে যত লোক নতুন পড়ুয়া হয়েছে তার এক-চতুর্থাংশও কাগজ-পড়ুয়া হচ্ছে না। হতে পারলে সারা ভারতের কাগজ উত্তরপ্রদেশেই বিক্রি হত। আদতে হেতুটি অন্যরকম করে বলা দরকার। প্রথমত সামান্য সংখ্যক ভাল কাগজ আছে, তাদের সমাদরও বর্ধমান। এটুকুই সুসমাচার। দ্বিতীয়ত এদেশের রক্তে একটা অতিকায় বৃত্তান্তপ্রবণতা আছে। অন্তত দু-হাজার বছর ধরে আমরা রামকাহিনী শুনেই চলেছি। রামকাহিনীর বহু গুণ—আমাদের গ্রহণশক্তিও ততোধিক বিপুল। তাছাড়া একই রঙ্গ থেকে আমরা বহুকাল ধরে বারবার রস গ্রহণ করতে পারি। বঙ্গে কানু ছাড়া গীত ছিল না ৮০০ বছর। হাওয়ার দাপটে নিমেষে কীভাবে গান্ধী দেবতা হয়ে ওঠেন, সেটা সতীনাথ (ভাদুড়ী) ঢোঁড়াইতে বলেছেন। তামিলনাড়ুতে শুনেছি বীরাপ্পানের দৈবযোগের কথা। এই বৃত্তান্তলিপ্সাও যে কোনো কর্ম বা অপকর্ম করে একটু গজানো নর বা দানব সবাইকে হাফ দেবতা বানানোর পৌত্তলিক অভিপ্রায়ের সুযোগ নিতে পারছে আমাদের কাগজগুলো। জাত-পাতে সুড়সুড়ি, সিনেমা, ধর্ম, এমনকি ডাকাতি করেও এখানে নিত্যনতুন অতিমানব সেলিব্রিটির আবির্ভাব ঘটছেই। একটির সঙ্গে অন্যটির রসায়নও ঘটছে। মুলায়মের সঙ্গে রামকাহিনী, লালুর সঙ্গে কৃষ্ণ ও যদুবংশ, ইন্দিরা ও জয়ললিতার সঙ্গে যে-যেখানে যেমন পেরেছে তেমন দৈবমহিমার যোগ; তারপর তাঁদের উত্থান-পতনের গুজব ও কাহিনী প্রজন্মান্তরেও বয়ে চলছেই। সে সঙ্গে জুড়েছে ভীষণ বা চমকপ্রদ ঘটনা বা অঘটনের অন্তহীন দৈনিক আবিষ্কার। মেলায় দু মাথাওয়ালা বাছুর ও ভেড়ার গায়ের গন্ধ শুঁকবার ভিড়। এ সমস্ত মিলেমিশেই সংবাদপত্রের

বাজারটা বাড়ছে। পাটনা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ এমনকি কলকাতার কাগজে জমকালো ও পিলে চমকানো হেডিং-এর কোথাও অভাব নেই। ফলে ব্যবসা সার্থক। তবে মনটাকে একটু থামালেই বোঝা যায়— এটা এক অলক্ষুণে সার্থকতা। আমেরিকার এক সম্পাদক (Charles A. Dana নাকি John B. Bagart !) বলেছিলেন মানুষ কুকুরকে কামড়ালেই নাকি খবর হয়। কথাটা চমকপ্রদ— হয়ত কিছুটা ব্যবসা সহায়কও। কিন্তু এক টুকরো শুকনো হাসি ছাড়া এ নির্দেশের সবটুকুই ক্ষতিকর। এ প্রজ্ঞাহীন দিকনির্দেশের মধ্যে সভ্যতার বহনযোগ্য কিছুই নেই। শেক্সপিয়ার চারশো বছর আগে বলে গেছেন, 'nature of bad news infects the teller'— কবিবাক্য অভ্রান্ত। এ জাতের খবরের ফলে আজ একটু ঝিকিমিকি হয়ে আগামীকে অন্ধকার করে।

আমাদের কলকাতাতেও একটা-দুটো কাগজ কু-পরিচালনার ফলে ঝাঁপ গোটালেও আমরা বিলেত আমেরিকার মতো কাগজের মড়ক বাঙলাতে এখনো দেখছি না। তবে কলকাতা ও আরও বড় শহরে কিছু মহল্লায় খবরের কাগজের পাঠক কমছে বা ইদানীং কম বাড়ছে। গাঁয়ে জেলায় বেশি বাড়ছে। টিভিও দেখছি চারিদিকেই বাড়ছে। জনগণনার হিসেবে ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২৬.৬ শতাংশ পরিবারের টিভি ছিল, ২০১১-তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫.৩ পরিবারে। এখন ২০১৭-তে টিভি, মোবাইল অনেক অনেক বেড়েছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গেও খবরের কাগজের মাথায় একটা ছায়া ঘনাইছে। তবে এখনো আমরা, পুরোনো আখরিয়ারা ও টিভি দেখিয়েরাও প্রায় সবাই কাগজ পড়ছি। একই খবর আগের রাতে ছবিতে দেখে পরের দিন কাগজেও পড়ছি। কেন পড়ছি? একটা অভিমত, বাঙালি কাগজ কিনছেন ও পড়ছেন তাঁদের আট পুরুষ ধরে বহমান কাগজ পাঠের অভ্যাসের ফলে। কাগজের সাথে পরাধীন দেশ পার হয়ে নতুন দেশেরও অনেক পাওয়া-না-পাওয়া এদেশে মিশে গেছে ফলে ভোরে কাগজপাঠ এক নিত্যকর্ম হয়ে উঠেছে। সব দেশেই নানাভাবে তা হয়েছিল তাই সে অভ্যাস এখানে কতদিন টিকবে বলা কঠিন। আমাদের শৈশবে ও যৌবনে বাঙালির সাহিত্যপাঠের যে ভোজসভা চারদিকে চলত আজ আর তা নেই। আরও কত অভ্যাস তো গেল। তাই এদিক থেকে কাগজ নিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না। মর্মার্থ— যাঁরা কাগজ বাঁচাতে চান তাঁদের অন্যদিক থেকে কাগজকে বলশালী ও প্রয়োজনীয় করে তুলতে হবে। চিত্রাঙ্গদার কথা ধার করে বলি, কাগজ যদি সঙ্কটে সম্পদে দেশবাসীর পাশে থাকে, কঠিনব্রতে যদি সহায় হয়, তবে মানুষ তাকে ছাড়বে কেন?

আরও একটা অভ্যন্তরীণ বিষ দুনিয়ার সব দেশেই আজকাল জমছে। আমেরিকার ও ইউরোপের একাধিক নির্বাচনে ঘুষ-খাওয়া সাংবাদিকতার (Paid News) কথা জোর গলায় উঠেছে। হিলারি ক্লিন্টনও এ অনুযোগ করেছেন। আমাদের দেশেও ভোটের সময় কথাটা বারবার উঠছে। নির্বাচন কমিশন Compendium of Instruction On Media Related Matters (2017)-এ অনেক সতর্কবার্তা ও নির্দেশ দিয়েছেন তবু এ অন্যায় বন্ধ হয়েছে বা হবে বলে কেউ মনে করেন না। সোজা কথায় সততা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে সংবাদের সম্পর্কটা জেনেটিক। সততার অনুপস্থিতিতে সংবাদ হয় না। ভোটের আগে নানাকারণে কাগজগুলো এক-এক দলের হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের নৈতিকতাকে, পাঠকের বিশ্বাসকে, সঙ্গে সেই জেনেটিক সম্পর্ককেও আঘাত করছে। খবরের কাগজকে যেখানে মানুষ নত হয়ে বুকের কাছে ধরে সেই দেবালয়টাই তাতে ভাঙছে। এটা অপরিণত কালিদাসের আগায় বসে গোড়ার ডাল কর্তনের মতো আত্মধ্বংসী কর্ম। বিজ্ঞাপনদাতার প্রতি নরম হওয়ার বিষয়টিও স্বনাশী তবে

একটা অভিমত, বাঙালি কাগজ কিনছেন ও পড়ছেন তাঁদের আট পুরুষ ধরে বহমান কাগজ পাঠের অভ্যাসের ফলে। কাগজের সঙ্গে পরাধীন দেশ পার হয়ে নতুন দেশেরও অনেক পাওয়া, না-পাওয়া এদেশে মিশে গেছে, ফলে ভোরে কাগজপাঠ এক নিত্যকর্ম হয়ে উঠেছে। সব দেশেই নানাভাবে তা হয়েছিল তাই সে অভ্যাস এখানে কতদিন টিকবে বলা কঠিন। আমাদের শৈশবে ও যৌবনে বাঙালির সাহিত্যপাঠের যে ভোজসভা চারদিকে চলত, আজ আর তা নেই। আরও কত অভ্যাস তো গেল! তাই, এদিক থেকে কাগজ নিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না।

কিছুকাল আগে এটা ভারতে বেশি ছিল। এখন বড় কাগজের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন সহজলভ্য হওয়ায় এ দোষ কমেছে বলে আমার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ। তবে উল্টো কথাটাকেই অনেকে বলেন ও মানেন। বহুমত, সততা ও নিরপেক্ষতা বর্জন করলে কাগজ হয় ইস্তোহার বা বিজ্ঞাপনী ছাইপাঁশ। দু-এক কড়ি সেখানে কিছুকাল পকেটে আসে কিন্তু অশ্রদ্ধার এই খুঁটি দীর্ঘস্থায়ী হবার কথা নয়। মিডিয়াতে সবাই যেখানে এক-একটা দলের হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছেন সেখানে দু-একবার বোকা বনে তারপর মানুষ আর কাউকেই বিশ্বাস করছেন না। ফলে পথে বসছে সত্যানুসন্ধান, বিদ্বান ও সাধারণ্যের যোগ, এমনকি বিজ্ঞানের প্রসারও। চারদিকে তাকিয়ে একটা ভয় পাই যে, বহু ভাবুক মন যেখানে মিলেছে, সেই মিডিয়াগুলোকে মুছে দিতে পারলে, কোথাও, কারো কারো, যেন মুনাফা গোছাবার পথ আরও কাঁটাহীন হতে পারে। হোয়াটস্-অ্যাপ বা নেটের নানা ডালপালা দিয়ে আগে খবরের কাগজ পরে টিভিকে সরানোর কথা এখনো শুনি নি, তবে আমেরিকার চলনের দিকে তাকালে সেই আশঙ্কাটা হয়। কাগজ ও টিভিকে রাখা খুব জরুরি, কারণ তার বহুকেন্দ্রিকতা, বিদ্বানযোগ আর রামমোহনের বলা ঐ অভিপ্রায়সমূহ। কাছাকাছি সময়ে নেপোলিয়ন বলেছিলেন, হাজারটা বেয়নেটের থেকে চারটে hostile কাগজ বেশি ভীতিপ্রদ — মোক্ষম কথা। ভারতে ৩০ কোটির বেশি লোক এখন কাগজ পড়েন। সাক্ষরতার লোকেরা একটু পাত্তা পেলে নেপোলিয়নের কথাটা দিনে দিনে এদেশে মোক্ষমতর হতে পারে।

এরপর সবথেকে গোলযোগের সমস্যা — অগ্রাধিকার নিরূপণ। অধ্যাপক দ্রেজ ও অমর্ত্য সেন মশাইরা ভারতের স্বাস্থ্যপরিষেবার শোচনীয় অব্যবস্থা ও অপ্রতুলতা নিয়ে সম্প্রতি (২০১৩) বিস্তারিতভাবে লিখেছেন তাঁদের 'An Uncertain Glory...' শীর্ষক গ্রন্থে। সেখানে তাঁরা দুটো পরিসংখ্যান দিয়েছেন। দেখিয়েছেন ২০০০ সালের জানুয়ারি থেকে জুনে ভারতের 'Finest' সংবাদপত্রসমূহের একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধও স্বাস্থ্য বা তৎ-সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে লেখা হয় নি। তারপর আবার এই সমীক্ষাটি ওঁরা করেছেন ২০১২ সালের শেষ ৬ মাস ধরে। এবারে করেছেন 'on the editorial pages of India's leading English-medium dailies'। এবারে দেখা গেল যে মাত্র ১ শতাংশ সম্পাদকীয় পরিসর স্বাস্থ্যপরিষেবার কপালে জুটেছে। মর্মার্থ ব্যথাস্থানে খবর বাজছে না। পৃথিবীতে সবথেকে বেশি অনাখর লোক এদেশে, তবু নিরক্ষরতা নিয়েও কাগজের আনুকূল্য সমগোত্রের। কাগজ যাতনার কথা বলছে না। অগ্রাধিকার ঠিক করার বিষয়ে কাগজগুলোর এই পক্ষপাতিত্ব কেন? আমার নিজের মনে হয় উপরে বলা কারণসমূহ ছাড়াও 'রাজনৈতিক ম্যানিপুলেশন' ও 'ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে স্বর্গলাভ' বিষয় দুটিতে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপিত হয়ে চলেছে বহুদিন। লোকহিত বা কল্যাণের নানা উদ্যোগ, জাগ্রতচিত্তের জয়গান ও বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ উপেক্ষিত হয়ে চলেছে। তবে সে আলোচনা এখানে নয়। অগ্রাধিকারের বিষয়টি ছুঁয়ে অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী মশাইয়ের একটা লেখা (আনন্দবাজার-৬.১.২০১৬) সবাইকে মনে করিয়ে দিই। শান্তিনিকেতনে তিনি অধ্যাপক অমর্ত্য সেন মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে লিখছেন, '...(তিনি) প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন, বিশেষত এই দুই অপরিহার্য খাতে অর্থবরাদ্দের শোচনীয় হ্রাস... নিয়ে।' সভাশেষে কুড়িজন সাংবাদিক অধ্যাপক সেনকে ঘিরে ধরলেন। পরের দিন— 'অর্ধেক কাগজে অনুষ্ঠানের কোনো উল্লেখ নেই! পাঠক পড়ে ভাববেন ভাষণের মূল বিষয় ছিল বামফ্রন্ট আমলে এ রাজ্যে শিল্পের আকাল ও তার ফলে কলকাতা বিমানবন্দরের জনহীন দশা'। অনুযোগটি ধীরভাবে ভাববার বিষয়। আমাদের সব থেকে বড় চিন্তক ও শিক্ষকরা একযোগে বলছেন সাংবাদিকেরা ও খবরের কাগজসমূহ বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নিরূপিত করছেন না। কম প্রয়োজনীয় (হুল্লোড়ে!) বিষয় অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে হটিয়ে দিচ্ছে।

যে দেশে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমবর্ধমান সেখানে মানুষের যাতনার খবর ও যাতনামুক্তির পথসন্ধান যদি এভাবে উপেক্ষিত হয় তবে শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের জোরে খবরের কাগজ কি বাঁচবে? বিজ্ঞাপনের টাকার জোরে ইউরোপ-আমেরিকার কাগজও বাঁচছে না। টাকা বাদ দিলে বিজ্ঞাপন মানেই লোভজাগানিয়া বাড়িয়ে বলা কথা। তথ্য ও সত্যের সঙ্গে তার চিরকালের আড়াআড়ি। এখানে কিছুদিন অন্যরকম হলেও বেশিদিন তা হবে না বলেই মনে হয়, আর তারে মানুষের তথ্যের সঙ্কট আরও ঘনীভূত হবে বলে খুব আশঙ্কা হয়।

উমা

ডাবরভাঙা খাল

মিলন দাস

কাঁখে ছোট শিশুকন্যা ময়নাকে নিয়ে একহাঁটু হোড় ঠেলে টানতে টানতে কল্পনা তার 'পানসি'টাকে মাকড়ির জলে ভাসায়। প্রত্যেকটা দিন এমনিভাবেই তার শুরু হয়। পানসি কল্পনার জানের যান তালগাছের গুঁড়ির ছোট একটি ডোঙার নাম। ডোঙায় পরিপাটি করে গোছানো একগুচ্ছ সুতি। সুতি এক ধরনের কাঁকড়া ধরার ছিপ, যাতে বঁড়শি থাকে না। থাকে, চার-পাঁচ লম্বা দু-আঙ্গুল মোটা বাইনের সরু বাতার হাতল। হাতলের দেড় গুণ লম্বা সরু শক্ত সুতো। আর এক টুকরো পোড়া মাটির খোলাভাঙার সঙ্গে আটকানো একখণ্ড মরা বেড়োর টোপ। খোলাভাঙাসহ টোপটা সুতোর একপ্রান্তে বাঁধা থাকে, অপর প্রান্তটা বাতার ডগায়। ডোঙার খোলের অধোভাগ ভরে গেছে এই সুতিগুচ্ছে। তার ওপর মাঝ-বরাবর রাখা একটা কাঁকড়া রাখার হাঁড়ি। ত্রিকোণাকৃতি ছাগুন জাল। গলুইয়ের খোলে অতি সাবধানে রাখা খাবার জলের ঘটি ও পান্তার ছোট ডেকচি। আর মাকড়ি? মাকড়ি একটি ছোট নদীর নাম, যেটি সুন্দরবনের আজমালমারি সংরক্ষিত বনের চিতুড়ি জঙ্গল ও কুলতলির গুড়গুড়িয়ার মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে পড়েছে মাতলায়। এই মাকড়ির জলে জোয়ারের টান লেগেছে। একতিলও আর দেরি করা চলে না। ডোঙার পেছন দিকে বৈঠাটা টেনে নিয়ে বসে কল্পনা। কোলের কাছে অতি আদরের সঙ্গে

টেনে নেয় তার শিশুকন্যাটিকে। তারপর সে বৈঠার ডগাটা পাঁকে ঠেকিয়ে সজোরে একটা ঠেলা দেয়। হ্যাঁচকা ঠেলায় নৌকাটা প্রবল গতি পায়। সেই গতির তালে প্রাণপণ বৈঠা টানতে টানতে জোয়ারের অনুকূলে তীরের বেগে সে ভেসে যায়, একটা খাল তাকে পেতেই হবে।

আসলে, মাকড়ি নদী থেকে চিতুড়িতে ঢুকে পড়া ভারানিখাল, ডাবরভাঙাখাল, বনচাপড়াখাল, পচাপাতাখাল প্রভৃতি যে কটা হাতেগোনা খাল ও তাদের ছোট ছোট উপখাল আছে তা কাঁকড়াশিকারি ডোঙা-মহিলাদের কাছে সংখ্যায় বড় নগণ্য। হাতামারা, কুমিরমারা— এরকম দু-একটি ব্যতিক্রম নাম ছাড়া প্রায় সকল খালের উপখালের নাম একই। যেমন, ক্যাওড়াখাল, বানিখাল, বোগড়াখাল, গোলবনিখাল ইত্যাদি। আসলে উপখালগুলির প্রত্যেকটির নামকরণ হয়েছে সেই খালে যে গাছের আধিক্য সেই গাছের নাম অনুসারে। তাই যেখানে বানি অর্থাৎ বাইন গাছের আধিক্য সেই উপখালের নাম বানিখাল; যেখানে বোগড়া অর্থাৎ হেতালের আধিক্য, তার নাম বোগড়াখাল; আবার যেখানে গোলপাতার আধিক্য সেই উপখালের নাম গোলবনিখাল। এই উপখালগুলির এক -একটি এক-একজনই এক-এক জোয়ারের জন্য দখল করতে পারে। তাই গনের সময় প্রতিদিন জোয়ার পড়লে ডোঙা-মহিলারা একপ্রকার যুদ্ধের গতিতে বৈঠা টানতে টানতে একে অন্যকে পেছনে ফেলে উপখালগুলি দখল করে। যারা দেরি করে বা পিছিয়ে পড়ে, তারা আর খাল পায় না। খালি হাতে শুকনো মুখ নিয়ে তাদের ফিরে যেতে হয়। সারা পথটা আর পাঁচটা মেয়ের মতো কল্পনাকেও জড়িয়ে থাকে উপখাল না পাবার একটা নিদারুণ ভয়। ভয় যত তাকে তাড়া করে, ছপছপ করে বৈঠা সে টানতে থাকে তত জোরে। তার চেয়েও তার বড় ভয়, যদি সামনে পড়ে ফরেস্ট বোট! এইভাবে ভয়ের ওপর ভয় বুকে নিয়ে কল্পনা তীরের গতিতে ঢুকে পড়ে ডাবরভাঙ্গাখালে। তারপর হাঁপ ছাড়ে হাতামারার মুখে এসে।

এই হাতামারা নামটার সঙ্গে কল্পনার জীবনটাও কেমন যেন জড়িয়ে গেছে। সে অনেক কাল আগের কথা। কল্পনা তখন শিশু। তখন জঙ্গলে সবেমাত্র ঘের দেওয়া বন্ধ হয়েছে। ঘের বলতে, বন বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত জঙ্গলে কাঠুরেদের একটি নির্দিষ্ট জায়গা জুড়ে কাঠ কাটার অনুমতি। তখন জঙ্গলে ঢোকার ওপর বিধিনিষেধ জারি হলেও ফরেস্টবাবুরা মধু, মাছ, কাঁকড়া সংগ্রহে কড়াকড়ি শুরু করে নি। জেলেদের সঙ্গে তাদের একটা দীর্ঘদিনের সখ্য গড়ে উঠেছিল। সেই অর্থে জরিমানার ব্যাপারটা ছিল না। যেটা ছিল, কোনো ভাল মাছ পেলে জেলেরাই ফরেস্টবাবুদের যাচত। মনে লাগলে বাবুরা নিত, না লাগলে নিত না। মাতলা বা ঠাকুরান পাড়ি দেওয়ার সময় ফরেস্টবাবুদের চোখে পড়লে তারা তাদের ভুটভুটি থেকে কাছি ছুঁড়ে দিত। তাতে হাল-দাঁড়ের জেলে ডিঙিগুলি নদী পাড়ি দিত সহজে। দিনগুলো আজ স্বপ্ন মনে হয়। তখন যেটা ভয়ের ছিল, তা ফরেস্টবাবুরা নয়, বাঘ। জঙ্গলের যত্রতত্র বাঘের দেখা মিলত। খালের মুখে খালপাটা লাগিয়ে ডিঙি থেকে চোখ রাখলে দিনের শেষে দেখা যেত বাঘের পাল খাল পেরোচ্ছে। আজ আর সেদিন নেই। বাঘশুমারি বলে, সংরক্ষণের জন্য বাঘের সংখ্যা এখন বেড়েছে। কিন্তু খালের মুখে ডিঙিতে বসে বাঘের দেখা মেলে কই! যাদের দেখা মেলে, তারা দুপেয়ে, খাকি উর্দিধারী। বাঘের সঙ্গে এদের বেশ মিল। বাঘ দেখতে সুন্দর, এরাও জেলেদের সেরা মাছটা, সেরা কাঁকড়াটা, তার ওপর মোটা উবরিটা খেয়ে শরীরটা করেছে টুসটুসে নধর নাদুসনুদুস হৃষ্টপুষ্ট। আর হিংস্রতা? সে তো বাঘের সেরা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বাড়া। বাঘ প্রাণে মারে, এরা লাথিবাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ডোঙা-ডিঙি কেড়ে নিয়ে ভাতে মারে। ভাতে মারা প্রাণে মারার চেয়ে কম কিসে? আজকাল ডিঙি করাটা অনেক খরচ। সকলে করতে পারে না। তুলনায় সামান্য ধার-দেনা বা দাদন নিয়ে ডোঙা করাটা সহজ। ডোঙায় ঝুঁকি আছে, বাঘে কুমিরে যখন তখন প্রাণ যেতে পারে, তবু যারা সহায়সম্বলহীন এটাই তাদের একমাত্র ভরসা। ডোঙায় মাছের তুলনায় কাঁকড়া ধরাটা সহজ। আজকাল বাজারে সুন্দরবনের কাঁকড়ার কদরও বেশ। তাছাড়া ফরেস্ট ভুটভুটির সাড়া পেলে বাদাবনে সহজে ডোঙা লুকিয়ে ফেলা যায়। তবুও কত যে ডোঙা বিট অফিসে পড়ে পড়ে পচছে তার ইয়ত্তা নেই। এই ডোঙা ধরাটা ফরেস্টবাবুদের বড় কাজ। সে রিপোর্টটা হেড অফিসে পাঠালেই নাকি হেড অফিস বোঝে, বেটারা নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে, না ডিউটি করছে। হেড অফিসের এ এক বিচিত্র নজরদারি পদ্ধতি। এতেই নাকি বাঘের সংখ্যা বাড়বে। আর তাই যদি হয়, চোরা শিকারিরা যে বাঘ, হরিণ সাফ করে দিচ্ছে তার কী হবে? তার দায় কে নেবে? তার জন্য তো নিরীহ গরিব জেলেরা আছে। যাদের ওপর সহজে শিকারের দায় উত্তরোত্তর চাপিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দিয়ে বন্ধ বাদার এলাকা উত্তরোত্তর বাড়ানো যায়, উত্তরোত্তর

নিজের পকেট বা সরকারি ভাঁড়ার ভরা যায়, উত্তরোত্তর অস্থায়ী বনকর্মীর স্থায়ী, বিট অফিসারের রেঞ্জার, রেঞ্জারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিল্ড ডিরেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিল্ড ডিরেক্টরের ফিল্ড ডিরেক্টর হওয়ার স্বপ্ন সত্যি করা যায়। এমনকি অপরূপা অর্ধাঙ্গিনীর অকালবৈধব্যও ঠেকানো যায়। কেন না, খামোখা খতরনাক চোরাশিকারিদের পিছু ধাওয়া করে অকালে প্রাণটা খোয়ানো— না! না! এমন বোকা বনবাবুরা না! খোয়ানোর দায় শুধু জেলেদের। খিস্তিতে তারা মান খোয়ায়। কিল লাথি লাঠিতে দেহের বল খোয়ায়। জাল ডিঙি-ডোঙা আটক হেতু পেটের সম্বলটুকু খোয়ায়। পেটের সম্বলটুকু উদ্ধারে ক্ষতিপূরণের নামে চক্রাহারে জরিমানা দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়। অসহায় দরিদ্র জেলেদের ওপর এ অত্যাচার সভ্য সমাজের অলক্ষ্যে অনেক দূরে নদী খাঁড়ি জঙ্গলের অন্তরালে নিরন্তর ঘটে চলে। প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় না। বিচার অট্টহাস্য করে। সরকারি চাকরি! পাওয়া যত কঠিন, যাওয়া তার চেয়েও বেশি কঠিন! বনবাবুরা তা বেশ বোঝে। তাদের এহেন বোধ অত্যাচারের মাত্রা ছাড়ায়, নিত্যনতুন অত্যাচারের ইন্ধন জোগায়। বনের হিংস্র বাঘ যদি বুঝত তাদের চেয়েও হিংস্র মানুষের চরম অনিষ্টকারী মানুষের মধ্যেই রয়েছে, তবে লজ্জায় হয়ত মুখ ঢাকত।

আজকের দু সন্তানের জননী কল্পনা তখন ছিল বাপের বড় আদরের ছোট্ট গুঁড়ি। এই হাতামারা তখনও পলি জমে জমে মজে গিয়ে আজকের মতো সরু হয়ে যায় নি। ডিঙি অতি সহজে ঢুকতে পারত। গুঁড়ি প্রায়ই বায়না করে বাপের সাথে এই জঙ্গলে আসত খালপাটা বা চরপাটা দিতে। কমপক্ষে একটা রাত জঙ্গলে কাটাতে হত। তারপর ভাসার বাজার হয়ে বাড়ি। ভাসার বাজারটা গড়ে উঠেছিল মাকড়ি নদীর পারের মধ্য গুড়গুড়িয়ায়। গুড়গুড়িয়া ও তার সংলগ্ন অঞ্চলের লোকেরা জঙ্গলে কাঠ, মধু, মাছ-কাঁকড়া সংগ্রহ করে নিয়ে যেত বাসার বাজারে। সেখানে তা বেচে চাল ডাল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনে তারা ফিরে যেত আপন আপন ঘরে। আর ভাসার বাজার থেকে ভরা কিস্তি চলে যেত রায়দিঘি, কাশীনগর, বিজয়গঞ্জ, মন্দিরবাজার, হটুগঞ্জ বা আরও দূরে ডায়মণ্ডহারবারে; কেউ বা নলগড়া হয়ে মনি নদী ধরে ভেসে যেত জয়নগরের দিকে। আবার কোনো কোনো কিস্তি মাতলা ধরে চলে যেত ক্যানিং। আবার ফিরে আসত এ তল্লাটের লোকদের প্রয়োজনীয় হরেক দ্রব্যাদি নিয়ে। ভাসার বাজারের সে দিনগুলি আজ আর নেই। নেই কাঠের গোলা, নেই গমগম, লোকেদের কোলাহল। অতীতের স্মৃতি নিয়ে বাজারটা আজও টিকে আছে বটে, তবে তা সপ্তাহে দুদিন কাঁচা সব্জির হাট হয়ে। এই ভাসার বাজারে তখন কল্পনার বাপের ছিল খুব নামডাক। সব আড়তদাররা একডাকে গুণা বহদ্দারকে চিনত। বাঘের মুখ থেকে ডিঙি ভরে মাছ-কাঠ-মধু আনায় তার জুড়ি এ তল্লাটে কেউ ছিল না। শোনা যায়, জঙ্গলে বিপদ বুঝলে সে হাঁক চড়াত। একজন বহদ্দারের যা কাজ, এ তাই। লোকের বিস্বাস, তার হাঁক ছিল মন্ত্রপূত; তার হাঁকের শব্দ যতদূর যেত ততদূর বাঘ সরে যেত। বাঘ সরে যেত কিনা তা বলা শক্ত। তবে যারা পেটের দায়ে প্রাণ হাতে করে বাদাবনে ঢুকত তারা যে সজাগ হয়ে যেত তা সহজেই অনুমেয়। জঙ্গলের একখালে সবসময় গুণা ঢুকত না। প্রত্যেকবারই খাল বদলাত। আজ ভারানি তো কাল বনচাপড়া।

সেদিন চারজন ভাগী ও শিশু কন্যা সঙ্গে করে গুণা ঢুকেছিল হাতামারায়। ডাবরভাঙার এই উপখালটায় খালপাটা দিতে। বিকেলের পড়ন্ত বেলায় সে রাতের রান্না সারছিল। উনুনে হাঁড়ির ভাত ফুটছে। গুণা হাতা দিয়ে ভাত নাড়ছে। সহসা একটা মাঝবয়সী ক্ষুধার্ত বাঘিনী ঝোপ থেকে বেরিয়ে ঝাঁপ দিল। আন্দাজটা ঠিক ছিল না। ডিঙির ডালিতে লেগে বাঘিনীটা পড়ল খালের জলে। তারপর তার সামনের পা দুটো ডিঙির ডালিতে তুলে ডিঙিতে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। ডিঙি দুলে উঠল। গর্জনে গর্জনে কেঁপে উঠল সারাটা বন। গুঁড়ি ভয়ে গুটিয়ে গেল। গলায় তার কান্না আটকে গেল। বাপকে ভয়ে জড়িয়ে ধরার ক্ষমতাটুকুও নেই। ডিঙির অন্য দাঁড়িদের অবস্থা আরও করুণ। তারা বাক হারিয়ে পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। শুধু একাই অবিচল গুণা বহদ্দার। সে গলা খেঁকিয়ে 'খানকি তোর স্পর্ধা তো মন্দ নয়' বলে গরম হাতাটা দিয়ে দিল ক' ঘা বাঘের চোখেমুখে কষিয়ে। এমন অপ্রত্যাশিত আক্রমণে বাঘিনী ঝাঁপ দিল জলে। জল গুলিয়ে ঘোলা জলে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে চলে গেল ঝোপের মধ্যে। তারপর গুণা গুঁড়িকে কোলে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরতেই কেঁদে উঠল সে। বিপদের মুখে সঙ্গীদের এই অদ্ভুত আচরণে ক্ষেপে উঠল গুণা। হাতা দিয়ে তাদেরকেও ক' ঘা মারল। সম্বিত ফিরল তাদের। সেই থেকে এই উপখালের নাম হাতামারা। হাতামারা আজও আছে। নেই গুণা বহদ্দার। অতি শৈশবে ঘটে যাওয়া সেদিনের সেই ঘটনাটা কল্পনার স্মৃতিতেও আজ আর ভাল করে নেই। প্রথম কবে সে এই হাতামারায় এসেছিল তাও তার মনে নেই। থেকে গেছে তার অজান্তে তার চোখের সামনে একটু একটু করে পলি

পড়ে ক্রমশ মজতে মজতে সরু থেকে সরু হয়ে যাওয়া ডাবরভাঙার এই উপখালটি; জড়িয়ে গেছে কল্পনার জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে। হাতামারার মতো তার জীবনটাও একটু একটু করে বদলেছে। আজও সে হাতামারায় আসে। কখনো কাঠের জন্য, কখনো কাঁকড়ার জন্য। কাঠ বলতে কাঁচা কাঠ নয়, শুকনো কাঠ জ্বালানির জন্য। কাঁচা যে নেয় না তা নয়, তবে তার পরিমাণটা অতি নগণ্য, ছিপের হাতল, বৈঠার হাতল বা ডোঙার লগি করার জন্য যেটুকু লাগে সেটুকুই। যদিও কাঁচা ডালপালা কাটায় আজকাল তার মন আর সায় দেয় না, কিন্তু এই ছোট ছোট ন্যূনতম চাহিদাগুলির জন্য এছাড়া তো তার আর কোনও উপায়ও নেই। অগত্যা কাটতে হয়। বুকে তার বড় লাগে। আজকাল মাছ কাঁকড়া কমেছে, বাদাবনের শেকড়ের মাঝে দু'চারটা মেলে। তাই বাদাবনের প্রতি তার হৃদয়ের টান। তার এ টান নিছক গাছের প্রতি ভালবাসা নয়, এ ভালবাসা নাড়ীর টানে, পেটের টানে। যে অনভূতিটা সে শহুরে কাগুজে বাবুদের মতো গচ্ছিত ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না, অথচ তার মনপ্রাণ জুড়ে আছে, তা হল, বাদাবন মাছ-কাঁকড়ার আঁতুড় ঘর। বাদাবন আছে, তাই মাছ-কাঁকড়া আছে, তার বাচ্চারা দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়। হায়রে হতভাগ্য নারী! তোর এই ভেতরটা যদি ওরা একটু বুঝত! আজ সে এখানে এসেছে, তবে কালপাটা নিয়ে নয়, তা যে ফরেস্টবাবুদের চক্ষুশূল! শুধু সুতি নিয়ে, কাঁকড়ার জন্য, যে কাঁকড়া গুড়গুড়িয়া থেকে কলকাতা হয়ে দুবাই কিংবা লন্ডনে যায়। যারা এ কাঁকড়ার আস্বাদ নেয় তারা জানে না, এ পোড়া দেশের কল্পনারা এ কাঁকড়া আহরণ করে তারা কত অসহায়!

অবিরাম বৈঠা টেনে ঘেমে নেয়ে সারা কল্পনা। শরীরটা একটু জিরান চায়। কিন্তু কষ্ট যতই হোক হাতামারার মুখে জিরিয়ে তার আর দেরি করা চলে না। চরচর করে জোয়ারের জল বাড়ছে। হাতামারায় হু হু করে জল ঢুকছে। সময় বয়ে যায়, সুতি ফেলতে হবে। তার চেয়েও কল্পনার বড় আশঙ্কা, এই বুঝি ফরেস্টবাবুরা এসে পড়ল। ওরা হয়ত এতক্ষণ ডাবরভাঙার মুখে এসে পড়েছে, ভুটভুটি ভেসে থাকার মতো জল পেলেই ঢুকে পড়বে। কল্পনা ঢুকে পড়ল হাতামারায়। হাতামারায় হাঁটু জল। তার দু'পাড় দিয়ে গাছ কল্পনার মাথার উপর ঝুলছে। স্বস্তি! আর তার ফরেস্টবাবুদের ভয় নেই। কিন্তু দক্ষিণরায়! সে যতই হিংস্র হোক কল্পনার কাছে, ফরেস্টবাবুদের মতো নয়। দক্ষিণরায়ের জন্য আছে মা। একটু চোখ বুজে সে স্মরণ করল বনবিবিকে, মা তুই দেখিস এ হতভাগীরে! বিষাক্ত সাপের হাত থেকে বাঁচতে স্মরণ করল মা মনসাকে। কুমিরের হাত থেকে বাঁচতে স্মরণ করল মা গঙ্গাকে। এরপর কল্পনা ডোঙার খোল থেকে একটি একটি করে সুতি তুলল। সুতির টোপে থু-থু-থু করল। এতে এঁসেপেতির কুদৃষ্টি কাটে। এঁসেপেতি আসলে মেছোপেত্নি। সুন্দরবনের কল্পনারা বিশ্বাস করে, একবার যদি তার কুনজর সুতির উপর পড়ে একটাও কাঁকড়া সেদিন আর মিলবে না। টোপ এঁটো করে কল্পনা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুতির হাতলের গা থেকে সুতো খুলল। নিজের ডানপাশে ডানহাত দিয়ে সুতির হাতলের নিম্নাংশটা জলের মধ্যে হাতখানেক পাঁকে পুঁতে দিল। বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পাশে টোপ বাঁধা সুতোটা টুপ করে জলে ফেলে দিল। তারপর বৈঠা দিয়ে ঠেলা দিয়ে একটু এগিয়ে গেল। আবার তিনবার থু করে আর একটা সুতি ফেলে এগিয়ে গেল। এইভাবে তার সমস্ত সুতি একে একে ফেলতে ফেলতে সে ঢুকে পড়ল বনের গভীরে, যেখানে সে দামি বড় বড় কাঁকড়া লাগার আনন্দে প্রাণ খুলে হাসলেও কেউ দেখবে না, বাঘ বা কুমিরের আক্রমণে চিৎকার করে কাঁদলেও কেউ শুনবে না। দ্রুত সুতি ফেলার কাজ শেষ করল কল্পনা। এবার শুধু অপেক্ষা, কখন টোপ ধরে কাঁকড়া টানবে আর ছাগুন জাল গলিয়ে তা সে তুলবে। এ অপেক্ষা শুধু তার একার নয়, তার মতো যারা পেটের টানে এ ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল বাদায় প্রাণ বাজি রেখে আসে তাদের সবার। তাদের মতোই সে এই ফাঁকেই একটু জিরোবার সময় পায়। বড্ড খিদে লাগে তার। তাই হাতামারার নোনা জলে সে হাত মুখ ধোয়। তারপর নুন পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা টক পান্তায় মেখে পরম তৃপ্তিতে সে খায়। তারই ফাঁকে মেয়ের মুখেও সে দুটো দুটো দেয়। তবে চোখ থাকে সুতিগুলোর দিকে। পাতের পান্তা ফুরোতে ফুরোতে সুতিতে টান লাগে। আর খাওয়া হয় না। ঢেকে রেখে কোনোরকমে এঁটো মুখে নোনা জল ছুঁইয়ে সে ছাগুনজাল হাতে তুলে নেয়। কাঁকড়া তুলে তুলে হাঁড়িতে রাখে। কখনো হাঁড়ি ভরে, কখনো ভরে না। সময় এগিয়ে চলে। বেলা গড়ায়। বাদা থেকে দ্রুত জল নামতে থাকে। তড়িঘড়ি করে সুতিগুলো একে একে টেনে টেনে ডোঙায় তোলে কল্পনা। ভাটার স্রোতে বৈঠা টানতে টানতে ফিরে চলে সে। আড়তে কাঁকড়া দিয়ে তবেই তার বাড়ি ফেরা, উঠোনে এসে হাঁপ ছাড়া। শরীরটা বড় শ্রান্ত। চোখ জুড়ে আসে তার। তবুও ঝুঁকতে ঝুঁকতে উনুনে আশুকা-আধশুকা

কাঠ-পাতার জ্বালে রাতের রান্না, পতির সেবা, সন্তানের ঘুমপাড়ানি গান, শরীর আর তার টানে না। সংসারের সবার চাওয়া-পাওয়া সখ আহ্লাদ মিটিয়ে সে টেনেহিঁচড়ে কোনোরকমে নিজের শরীরটাকে বিছানায় এনে ফেলে। তাতেও তার রোজনামচার শেষ হয় না। কেন না, একটা ভয়ানক আশঙ্কা তাকে ঘুমের মধ্যে তাড়া করে, ছ্যাঁক ছ্যাঁক তার ঘুম ভেঙে যায়, ভোরের জোয়ার! ক্লান্তির ঘুম বড় মরণঘুম! সময়ে ভাঙবে তো!

সেদিন বিকেলে, অন্যদিনের তুলনায় খানিকটা আগে ফিরল কল্পনা। সব যেন কেমন নিঃশব্দ থমথমে। ঠিক যেন ঝড়ের পূর্বাবস্থা। স্বামীর সাড়া নেই, ঘরের দুয়ারে বসে ঘাটের দিকে চেয়ে তার ফেরার অপেক্ষায় থাকতেও তাকে দেখা গেল না। ঘাট বলতে মাকড়ি নদীর পাড়ের পচামুড়ির ঘাট। সেই অর্থে ঘাটটি পাকা জেটি নয়। পূর্ব গুড়গুড়িয়ার লোকেরা এখানে বাইন গাছের আড়ালে নিরাপদে ডিঙিডোঙা রাখে। বহুদিন আগে কলামান্দাসে শোয়ানো একটা সাপে কাটা মরা ভরা কোটালে জোয়ারের টানে মাকড়ির জলে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে বাইনের ঝোপের মধ্যে আটকে যায়। পরের জোয়ারটা কম ওঠায় মান্দাসটা নামতে পারে নি। বেশ কয়েকটা দিন আটকে পড়েছিল। মরার পচা দুর্গন্ধ আর তার বখরা নিয়ে গাঁয়ের কুকুরগুলোর রাতদিন তাণ্ডব, কামড়াকামড়ি ও অদ্ভুত চিৎকারে গাঁয়ের লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। গাঁয়ের লোকদের অনুরোধে গুণা বহদ্দার দু বোতল ধেনো খেয়ে মান্দাসটাকে টেনে নামিয়ে নদীর জলে ভাসাতেই সে যাত্রায় রক্ষে হয়েছিল। সেই থেকে এর নাম পচামুড়ির ঘাট। আর এখানেই কল্পনার বাড়ি। বাড়ি বলতে বাঁধের বাইরে নদীর দিকে একটি ছোট্ট কুঁড়ে। কুঁড়েটি দু-কক্ষ বিশিষ্ট। তার একটা কক্ষ শোয়ার, আরেকটা রান্নাসহ ভাঁড়ার। দেওয়াল মাটির। আর চালা বাইন পাতা ও খড়ের। গত দু-তিন সাল হাতটানের জন্য চালার খড় বদলানো হয় নি। কোথাও কোথাও খুব পচে গেছে। এ বছরের বর্ষাকালটা কল্পনা তার স্বামী ও বাচ্চাদের নিয়ে খুব কষ্টে কাটিয়েছে। কেন না, চালার যেখান সেখান দিয়ে ফুটো হয়ে জল পড়ছে। বাদা থেকে চুরি (?) করে আনা গোলপাতার গোঁজা দিয়েও তা রোখা যায় নি। তবুও তার মুখে সবসময় একটা হাসির আভা। ভেতরের দুঃখটা কাউকে সে বুঝতে দেয় নি। একপাশে নদীর ধারে সে পড়ে থাকে, কারো লক্ষ্যেও তা পড়ে নি।

অথচ তার জীবনটা এমন হওয়ার কথা ছিল না। নিতাইকে তার ভাল লাগত। বাপও অমত করে নি। বিয়ে দিয়েছিল তার সাথে। নিতাই বাপের একলা ছেলে। নিতাইয়ের সঙ্গে যখন তার বিয়ে হয় তখন তাদের জাল-ডিঙি, ছোট্ট একটা ভিটে, পুকুরঘাট সবই ছিল। বর্ষাটায় চিতুড়ির আশপাশে থাকলেও বর্ষান্তে মাতলা শান্ত হলে নিতাইয়ের হাত ধরে সে পাড়ি দিত হেড়োভাহগা, নেতিধোপানি, হলদি, মায়াদ্বীপ কিংবা ভাঙ্গাদুনি। আবার কখনো ঠাকুরানের বুক চিরে চলে যেত দুলিভাসানি, চুলকাটি কিংবা আরও দূরে গোকুলতলি খাঁড়ি ছুঁয়ে বুলচেরি দ্বীপে। দিনগুলো তার কাছে স্বপ্নের মতো ছিল। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন একদিন থেমে যায় চামটায় এসে। সে বছর টাইগার রিজার্ভের বিএলসি-র ভাড়া অত্যন্ত চড়ে যাওয়ায় রিজার্ভ ফরেস্টের বিএলসি ভাড়া করেছিল নিতাই। বিএলসি হল বোট লাইসেন্স। বনবিভাগ এই লাইসেন্স দেয়। এই লাইসেন্সপ্রাপ্ত নৌকাগুলি জঙ্গলে মাছ ধরার জন্য যেতে পারে। যাওয়ার আগে এই লাইসেন্সের ভিত্তিতে অনুমতিপত্র মেলে। টাইগার রিজার্ভ ও রিজার্ভ ফরেস্ট এই দুই ভিন্ন এলাকার জন্য আবার বিএলসি-ও ভিন্ন ভিন্ন। অধিকাংশ জঙ্গলনির্ভর মৎস্যজীবীর কোনোপ্রকার বিএলসি নেই। তারা ভাড়া করে। বিএল সি-র মালিকরা অধিকাংশই আজকাল শহরবাসী। নৌকা থাকুক বা না থাকুক, জলে পা দিক বা না দিক তারাই বংশপরম্পরায় বিএলসির মালিক। আর তা ভাড়া খাটিয়ে বংশ পরম্পরায় তারা মোটা টাকা ভোগ করে। এ কতকটা ব্রিটিশ ভারতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো। ফারাকটা এই, এর জন্ম অব্রিটিশ ভারতে। বিএলসির মধ্যে আবার উঁচু নীচু পার্থক্য আছে। মরশুমে রিজার্ভ ফরেস্টের বিএলসি যেখানে চার-পাঁচ হাজারে মেলে সেখানে টাইগার বিএলসির জন্য চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার কিংবা তারও বেশি দিতে হয়। কারণটা অতি সহজ। বিজার্ভ ফরেস্টের তুলনায় টাইগার রিজার্ভে গুণে-মানে-পরিমাণে মাছ কাঁকড়া অনেক বেশি মেলে। তাই যাদের ট্যাঁকের জোর থাকে না তারা চুরি(?) করে টাইগার রিজার্ভে ঢুকে পড়ে, ঠিক যেমনভাবে সেদিন নিতাই ঢুকে পড়েছিল চামটায়।

তখন জাল ফেলার প্রস্তুতি চলছিল। কানে এল ফরেস্ট ভুটভুটির শব্দ। নিতাই ধরা পড়লে সম্ভাব্য কী কী হতে পারে তা ভেবে ভয়ে কাঁপতে লাগল। ধরা পড়লে লাথি গালি তো জুটবেই, তার ওপর বিএলসিটা তুলে নেবে, পুরো মরশুমটা মাঠে মারা যাবে, জাল ডিঙিটাও বোধ হয় এবার নিয়ে যাবে। ফরেস্ট ভুটভুটির সাড়া বাড়ছে। নিতাই আর স্থির থাকতে পারল না। আগুপিছু বিবেচনা না করে তড়িঘড়ি জঙ্গলের সরু খালে ডিঙি ঢুকিয়ে দিল সে। যখন বিপদটা কাটছে,

ভুটভুটির শব্দটা ক্রমশ বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে, তখনই বাধল বিপদটা। বাঘ ঝাঁপ দিল নৌকায় নিতাইয়ের ঘাড় লক্ষ্য করে। দৈবক্রমে নিতাই একটু হেলে যাওয়ায় বাঘ তার ঘাড়টা নাগালে পেল না ঠিকই, কিন্তু বাঘে-মানুষে মরণবাঁচন লড়াই বেধে গেল। কল্পনা এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে হাতে বৈঠা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের উপর। এই না হলে গুণা বহদ্দারের মেয়ে! তার বৈঠার উপর্যুপরি আক্রমণে বাঘ রণে ভঙ্গ দিল ঠিকই, কিন্তু এক অবর্ণনীয় অসহনীয় যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল তার আহত স্বামী। তা দেখে তার দু চোখ ভরে জল এল, কিন্তু কাঁদতে পারল না। এ অবস্থায় তার কাঁদা চলে না। একতিলও দেরি না করে দাঁতে দাঁত চেপে সে স্বামীকে পাটাতনের সঙ্গে কাছি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। ডিঙির পালটা তুলে দিল। পালের নিয়ন্ত্রক দড়িটা চেপে ধরল পায়ে। হালটা চেপে ধরে বলস ডিঙির পেছনে। একটু চোখ মুদে বাবাসাহেবকে একবার স্মরণ করল। উত্তুরে হাওয়া পালে লেগেছে। সোঁ সোঁ করে তীরের বেগে সে পাড়ি দিল নেতিধোপানি খাল হয়ে মাতলা।

সেবার কল্পনা স্বামীকে বাঁচাতে পেরেছিল। কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ করতে পারে নি। পঙ্গু হয়ে গেল মানুষটা। হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ জোগাতে জোগাতে জাল নৌকা ভিটেমাটি সব চলে গেল। পঙ্গু হয়ে গেল সংসারটাও। সব হারিয়ে একরাশ দেনার বোঝা মাথায় নিয়ে পঙ্গু স্বামী ও দুটো বাচ্চাকে সঙ্গে করে সে চলে এল এই নদীর ধারে। শুরু করল নতুন করে বাঁচার লড়াই। বাঁধল এই ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটি, যেখানে এই অবেলায় আধো-অন্ধকারে শুয়ে তার অশক্ত পঙ্গু স্বামী। (চলবে)

দলিত নিগ্রহঙ্ম বীজ লুকিয়ে সমাজের অন্দরেই

অভিরূপ ঘোষ

সংরক্ষণ অতি স্পর্শকাতর ইস্যু। ভোটযুদ্ধের মোক্ষম অস্ত্রও বটে। স্বাধীনতার পর থেকে হয়ে চলা সব নির্বাচন তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সর্বশেষ উদাহরণ ২০১৫ সালের বিহার বিধানসভা। মোহন ভাগবতের বক্তব্য কীভাবে ১০ কোটির একটা রাজ্যের তথা গোটা দেশের রাজনীতির রঙ বদলে দিয়েছিল সেটা ভবিষ্যতে ইতিহাস হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রশ্নটা এখানেই। সংরক্ষিতরা কী শুধুই ভোটব্যাঙ্ক, নাকি শেষ ৭০ বছর ধরে শুধুই 'উন্নয়নশীল' হয়ে থাকা এক রাষ্ট্রের তথাকথিত উন্নতির শরিক?

দলিত নিগ্রহ এখন দেশের হট টপিক্স। রোহিত ভেমুলার মৃত্যুর পর শুরু হওয়া এই সমালোচনার আঁচে গুজরাট থেকে শুরু করে বিহার, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ সবার মুখ পুড়েছে। প্রশ্ন ওঠে, এর জন্য দায়ী কি শুধুই একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল? নাকি এটা ভোটপিপাসু রাজনৈতিক রাক্ষসকুলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফল।

দরিদ্রপ্রধান ভারতবর্ষে হতদরিদ্র উচ্চবর্ণের কথা কেউ বলে না, অন্তত প্রকাশ্যে। পতিদার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গুজরাট সরকার অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়াদের জন্য কিছুটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেও তা সারা দেশের সাপেক্ষে 'বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন' এবং সেখানেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং বিরোধিতা। তবে কি রাষ্ট্রের বিশেষ সাহায্য শুধুই পিতৃপ্রদত্ত পদবীর ওপর নির্ভরশীল! স্বাধীনতার ৭০ বছর পরও রাষ্ট্র-সাহায্যকৃত বংশানুক্রমিক বর্ণাশ্রম।

যদি প্রশ্ন করা হয় দলিত কারা, উত্তরটা বোধহয় অতটাও সহজ নয়। দলিত অর্থাৎ অবদমিত, অস্পৃশ্য জাতি। যদিও দলিত সব ধর্মের মধ্যেই আছে, তবে হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে দলিতরা চার প্রথার বর্ণাশ্রমের বাইরে পঞ্চম একটি প্রথার মানুষ— 'পঞ্চমা'। উপমহাদেশে বর্ণাশ্রমের শুরুটা হয়েছিল কাজের ভিত্তিতে, পরে তা বংশানুক্রমিক হয়ে যায়। এই দলিতরা তথাকথিত অস্পৃশ্য কাজ, যেমন মরা পোড়ানো, মৃত জন্তুর ছাল ছাড়ানো বা মলমূত্র পরিষ্কারের কাজ করত। তাই এদেরকে সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য করে রাখা হত। সেই হিসাবে বর্তমানের তপশিলি জাতিরাই দলিত হওয়া উচিত ছিল। অপরদিকে আম্বেদকরের কথা অনুযায়ী যে কোনো পিছিয়ে পড়া এবং অত্যাচারিত জাতিই দলিত। তবে স্বাধীনতাত্তর ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতাকে স্থান দেওয়া হয়

নি সংবিধানে। তাই সংবিধানে 'দলিত' বলে কোনো শব্দ শব্দ নেই (২০০৮ সালের সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে 'দলিত' একটি অসাংবিধানিক শব্দ)। পরিবর্তে ভারত সরকার 'তপশিলি জাতি এবং উপজাতি' শব্দবন্ধ ব্যবহার করে, সেই অর্থে এটিই 'দলিত' শব্দের সরকারি নাম। মহাত্মা গান্ধী অবশ্য 'অস্পৃশ্য'-দের 'হরিজন' (যার অর্থ 'ঈশ্বরের সন্তান') নামে ডাকতেন এবং উক্ত নামে একটি পত্রিকাও বের করতেন, তবে স্বাধীন ভারতে সরকারিভাবে এই নামও স্বীকৃতি পায় নি।

স্বাধীন ভারতে পিছিয়ে পড়া তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা দানের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এদের জন্য সরকারি ক্ষেত্রে বিশেষ সংরক্ষণের (বর্তমানে বাইশ এবং সাড়ে সাত শতাংশ) ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীকালে (১৯৯৫ সালে) তথাকথিত দলিতদের ওপর অস্পৃশ্যতা, অত্যাচার এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী মনোভাব দূর করার জন্য বিশেষ আইনের সংস্থানও হয়। ফলও মেলে কিছুটা। ১৬.৬ শতাংশের তপশিলি জাতি এবং ৮.৬ শতাংশের তপশিলি উপজাতিদের (২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে) অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে এবং বর্তমানে তা জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের প্রায় সমান। দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারি উদ্যোগ সত্ত্বেও তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য নির্ধারিত কেন্দ্রীয় সরকারি পদের একটা অংশ আজও ফাঁকা পড়ে থাকে। এই পদ পূরণের জন্য ১৯.১১.২০০৮-৩০.০৬.২০১১ পর্যন্ত বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। তারপরও ২০১২ সালে শেষ হওয়া অর্থবর্ষে তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য নির্ধারিত পদের ৩২৫০৬টি ফাঁকা পড়ে থাকে। বেসরকারি ক্ষেত্রে ত আবার এই বিশেষ সুবিধাটুকুও নেই। তাই সেখানে দলিত অংশগ্রহণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে আরও কম।

অর্থাৎ এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে সরকারিভাবে দলিতদের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ করা হয়েছে, অন্তত খাতায় কলমে। সমস্যা তবু থেকেই গেছে।

২০১১-১২ সালে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক স্তরের মোট স্কুলছুটের অর্ধেক দলিত। অনেক জায়গায় (প্রায় ৩৫ শতাংশ) দলিত শিশুদের অন্যদের সাথে একসঙ্গে মিড ডে মিল খেতে দেওয়া হয় না, কোথাও (প্রায় ২৮ শতাংশ) তাদের খাওয়ার পাত্রে আলাদা চিহ্ন দিয়ে দেওয়া হয়। বহু জায়গায় সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীরা দলিত পরিবারের চিকিৎসা করতে অনীহা দেখান, তাদের একসঙ্গে রেশনও দেওয়া হয় না। ওই একই বছরের রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে প্রতি ১৮ মিনিটে একজন দলিতের বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠিত হয়। প্রতিদিন গড়ে তিনজন দলিত মহিলা ধর্ষিতা হন। সপ্তাহে অপহরণ এবং খুনের সংখ্যা যথাক্রমে গড়ে ৬ এবং ১৩টি। স্বভাবতই বাড়ে দলিতদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা। ২৫ শতাংশের জনসংখ্যার দলিত সম্প্রদায়ের জেলবন্দির হার প্রায় ৩৩.২ শতাংশ।

অর্থাৎ ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। সমস্যা মূলত আর্থসামাজিক। সামাজিক উন্নয়নের দায় কিছুটা সরকারের থাকলেও পুরোটা অবশ্যই নয়। সরকারি আমলা বা মন্ত্রীরা মঙ্গলগ্রহ থেকে আসা মানুষ নন, তাঁরাও সমাজেরই অংশ। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় দলিতদের জন্য নির্ধারিত আসনে জিতে আইনসভায় গিয়ে দলিত জনপ্রতিনিধিরাও অধিকাংশ অন্যদের মতো নিজেদের আখের গোছাতেই বেশি মনোনিবেশ করে থাকেন।

	১৯৯৫ (শতাংশের হিসাবে)		২০১১ (শতাংশের হিসাবে)	
শ্রেণী	তফসিলি জাতি	তফসিলি উপজাতি	তফসিলি জাতি	তফসিলি উপজাতি
প্রথম	১০.১৫	২.৮৯	১১.৫	৪.৮
দ্বিতীয়	১২.৬৭	২.৬৮	১৪.৯	৬.০
তৃতীয়	১৬.১৫	৫.৬৯	১৬.৪	৭.৭
চতুর্থ	১৬.১৫	৬.৪৮	২৩.০	৬.৮
মোট	১৬.০৫	৬.১৩	১৯.৫	৭.৫
	(তথ্যসূত্র ঃ রাজ্যসভার কার্যবিবরণী এবং জাতীয় তথ্যসংস্থা)			

বাস্তব অভিজ্ঞতা এও বলে, দলিত প্রধান এলাকায় অ-দলিত প্রার্থীর ভোটে জিতে আসাটা ব্যতিক্রমী হিসাবেই দেখা হয়। প্রার্থীর মান বা যোগ্যতা নয়, সেখানে দলিতদের কাছেও জাতটাই বিচার্য হয়ে ওঠে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তারা নিজেরাই নিজেদের শুধুমাত্র একটা ভোটব্যাঙ্কে পরিণত করে।

'উন্নয়নশীল' ভারতবর্ষ এমনিতেই মাথাপিছু গড় আয়ের হিসাবে অনেকটা পিছনে। জিডিপির মান উপরের দিকে হলেও শোনা যায় ১২৫ কোটি দেশের অর্ধেক সম্পত্তি নাকি ১৫টি পরিবারের হাতেই সীমাবদ্ধ! একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, দলিতদের মধ্যেও অর্থনৈতিক অসাম্য প্রবল। যেখানে দারিদ্রসীমার নীচে থাকা তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের আনুপাতিক হার জাতীয় হারের চেয়ে অনেকটাই নীচে, সেখানে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় চাকরি ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের হার জাতীয় হারের প্রায় সমান। ২০১১ সালের জনগণনায় দেখা গেছে, একটি পরিবারে একাধিক সদস্যের চাকরির সংখ্যা যেখানে সর্বভারতীয় হিসাবে ৫.১ শতাংশ, সেখানে তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের ক্ষেত্রে এই মান প্রায় দ্বিগুণ ৯.৯ শতাংশ। ঘটনা হল, দলিত নিগ্রহের অধিকাংশ বলি দরিদ্র এবং অতি দরিদ্ররা। দলিত নিগ্রহের মূল কারণ তাই অর্থনৈতিক। দেখা যাচ্ছে, পাঞ্জাবে শতাংশের হিসাবে সবথেকে বেশি তপশিলি জাতি (৩১.৯ শতাংশ) থাকলেও অস্পৃশ্যতা বা দলিত নিগ্রহের তালিকায় ওই রাজ্যের স্থান পিছনের সারিতে। এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, পাঞ্জাব শিখ অধ্যুষিত হওয়াতে এটা ঘটে। দেখা যাচ্ছে যেখানে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ২৭ শতাংশ ভারতীয় অস্পৃশ্যতা অভ্যাস করেন, সেখানে ২৩ শতাংশ শিখও এটা করে থাকে। পাঞ্জাবে তুলনামূলক কম দলিত নিগ্রহের কারণ তাই মূলত অর্থনৈতিক। একই কারণে পাঞ্জাবের মতো মাঝারি মানের অর্থনীতি পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩০ শতাংশ তপশিলি জাতি এবং উপজাতি থাকলেও তালিকায় এ রাজ্যও পিছনের দিকেই অবস্থান করে। অপরদিকে তালিকার ওপরের দিকের রাজ্যগুলির যেমন, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড বা হিমাচল প্রদেশের মাথাপিছু গড় আয় বেশ কম। তাছাড়া এই রাজ্যগুলির ধনের অসাম্য পশ্চিমবঙ্গ বা পাঞ্জাবের চেয়ে অনেক বেশি। আরও লক্ষণীয় বিষয় হল, যে সমস্ত রাজনৈতিক দল নিজেদের দলিত দরদী প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে, হয় স্বাধীনতার পর এই রাজ্যগুলির মসনদে অধিকাংশ সময় তারাই বসেছিল না হয় ক্ষমতা পেয়ে তারা নিজেদের প্রতীক এবং বিজ্ঞাপনেই অধিকাংশ ব্যয় করেছে বা করছে। তাই তাদের এ কান্না কুম্ভীরাশ্রু ছাড়া আর কিছুই নয়। কেন্দ্রের শাসক, বিরোধীসহ কোনো ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলই নিজেদের ঘাড় থেকে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে পারে না, কারণ সুবিধামতো এরা প্রত্যেকেই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করে।

অন্যদিকে স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি বা বিচারপতিদের একটা বড় অংশ ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের হিন্দু হলেও জাতিগত সংরক্ষণের চাপে বর্ণহিন্দুদের একটা বৃহত্তম অংশ, যাদের আমরা 'সাধারণ' বলি, আজ সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত। যথার্থ দরিদ্র হলেও পিতৃদত্ত পদবীর জন্য অনেকে সরকারি সুযোগ সুবিধার থেকে দূরে থেকে যাচ্ছে। এই ঘটনা দেশের বুকে জাতিবিদ্বেষ বাড়াচ্ছে বৈ কমাচ্ছে না। বিশ্বায়নের যুগে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি ক্ষেত্রে কাজের জন্য জাতিগত সীমারেখাও আর নেই, কিন্তু প্রোমোশনের ক্ষেত্রে আছে। ফল সহকর্মীদের মধ্যে জাতিগত বিবাদ। সাধারণদের যারা চাকরি না পেয়ে কৃষি, ব্যবসা বা অন্যান্য কাজ করছেন, তারাও কোনভাবেই এই জাতিগত সরকারি বৈষম্য মেনে নিতে পারছেন না। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়ছে সমাজে। কখনও কখনও তা রূপ নিচ্ছে ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের (পাতিদার, জাঠ, কুরমি আন্দোলন)। যখন তা পারছে না, ক্ষোভের শিকার হচ্ছে কিছু নিরীহ মানুষ, তাদের চোখে যারা 'সরকারিভাবে বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত'। গুজরাট, কর্ণাটক বা বিহারের দলিত নিগ্রহ তাই কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এর শিকড়টা উপড়ে ফেলাও কয়েকদিনের রাজনৈতিক পর্যটনের কম্ম নয়।

উমা

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থানঃ পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া), শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন **নম্বরঃ** ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

রান্নাঘরে কান্না

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশ দূষণ নিয়ে গোটা বিশ্ব আজ চিন্তিত। কার্বন ডাই-অক্সাইড জাতীয় গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্রা বেড়ে গিয়ে পৃথিবীতে হচ্ছে উষ্ণায়ন। উষ্ণায়নের কুফল হল সুদূরপ্রসারী— জলবায়ু পরিবর্তন, হিমবাহের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রে জলস্ফীতি ও তার ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায় চলে যাওয়ার আশঙ্কা বিজ্ঞানীরা করছেন। এসব ব্যাপার নিয়ে বিশ্বের বড় বড় মাথারা করছেন চিন্তন বৈঠক। তার সর্বসম্মত সমাধান অবশ্য এখনও বেরোয় নি। তবে গ্রিন হাউস গ্যাস এফেক্ট, গ্লোবাল ওয়ার্মিং জাতীয় ভারী ভারী কথাগুলো আজ সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এ নিয়ে চলেছে সেমিনার, বক্তৃতামালা, জনসচেতনার জন্য যা প্রয়োজন।

বাতাসে দূষিত গ্যাসের উৎস সন্ধান করতে আমাদের অবশ্য দূরে যেতে হবে না, বড় বড় কেতাবও পড়তে হবে না, এমন কি বাড়ির চৌকাঠ না পেরোলেও চলবে। এটা প্রায় সর্বত্র দৃশ্যমান। হ্যাঁ, আমি আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র বাড়ির রান্নাঘরগুলোর কথাই বলছি। একে বলা যায় 'পলিউশন বিগিনস অ্যাট হোম'। এখনও ভারতের গ্রামের অসংখ্য ঘর ও কুটিরের রান্নাঘরে প্রধান জ্বালানি হল কাঠকুটো ও ঘুঁটে গোবর। গ্রামের গরিব বাড়ির মা-বোনেরা উনুনে ওই সব জ্বালানি পুড়িয়েই তাঁদের রান্না করেন, কারণ এগুলো দামে সুলভ। প্রত্যন্ত গ্রামে কয়লা বা গ্যাস পাবেই বা কোথায়! আর পয়সাই বা কে জোগাবে! ওই জ্বলন্ত কাঠকুটো থেকে নির্গত ধোঁয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড, মনো-অক্সাইড ও সালফার ডাই-অক্সাইডে ভর্তি গ্যাসের সঙ্গে আছে মারাত্মক পার্টিকুলেট ম্যাটার বা কণা জাতীয় পদার্থ। মেয়েদের অনেকটা সময় রান্নাঘরে কাটাতে হয়, ফলে অবিরাম তাঁদের ফুসফুসে ঢোকে ওই সব দূষিত গ্যাস ও সূক্ষ্মকণা। ফল— হাঁপানি, ফুসফুসের ক্যান্সার, চক্ষুরোগ প্রভৃতি।

শহরাঞ্চলের রান্নাঘরে আজকাল অধিকাংশ বাড়িতেই গ্যাস। জ্বালানি হিসেবে এলপিজি যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তেমনই এর ক্যালোরিফিক ভ্যালুও অনেক বেশি ফলে বেশি উত্তাপ ও কম সময়েই রান্না শেষ হয়। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামের গরিবদের ওই কাঠকুটোর জ্বালানিতে যেমন দূষিত গ্যাসের নির্গমন তেমনই উত্তাপও কম। গৃহিনীদের প্রাত্যহিক রান্নাটা একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা করতে হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাঁদের শরীর স্বাস্থ্য।

গরিবদের ঘরের চৌকাঠের মধ্যেই এই পরিবেশ দূষণ কাটাতে এতদিনে একটা সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সাফসুতরো এলপিজি গ্যাসে রান্নার সুযোগ কেন শুধু সমাজের ধনী মধ্যবিত্তরাই পাবে, গরিবরা কেন পাবে না, এই ভাবনাতেই 'উজ্জ্বলা যোজনা'র মাধ্যমে গরিব পরিবারের হেঁসেলেও গ্যাস ঢুকছে। এক বছরে ভারতের প্রায় দু কোটি গরিব বাড়িতে ওই দূষণহীন গ্যাস সিলিন্ডার সুলভে ঢুকেছে। ২০১১ সালের এক সমীক্ষায় জানা গিয়েছিল, ভারতে ১২ কোটি পরিবার কাঠকুটো দিয়ে এবং দু কোটি পরিবার শুধু ঘুঁটে গোবর দিয়ে উনুন জ্বালিয়ে রান্না করেন। এলপিজি ব্যবহার করেন সমগ্র দেশে মাত্র তিন কোটি পরিবার। সেই গ্যাসও আবার ভর্তুকি দামে। উচ্চ ও মধ্যবিত্তরাই শুধু এ সুবিধা ভোগ করতেন। প্রত্যন্ত গ্রামের পরিবারের ভাগ্যে ছিল উত্তপ্ত পার্টিকুলেট ম্যাটারের ছাই আর চোখ-জ্বালা করা ধোঁয়া।

এবার একটু ২০১১ সালের এই রাজ্যের গ্যাস সংযোগের তথ্যের দিকে তাকানো যাক। তখন এ রাজ্যে গ্যাস সংযোগ ছিল ৪৮ লক্ষ আর এখন ১ কোটি ১৮ লক্ষ। বছরে প্রায় ২৫ লক্ষ নতুন গ্যাস সংযোগ দেওয়া হচ্ছে দারিদ্যসীমার নীচের গৃহস্থালিতে। এটার ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্র না রাজ্য সে তর্কে গিয়ে লাভ নেই, গরিবরা কিন্তু এখন উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে গ্যাসে রান্নার সুবিধা পাচ্ছে— এটা একটা বড় ঘটনা। আগামী দু বছরে আরও ৫০ লক্ষ গরিব বাড়ির হেঁসেলে গ্যাস আসবার কথা। ১০০ শতাংশ রান্নাঘরে কবে গ্যাসে রান্না হবে জানা নেই তবে নানান হতাশার মধ্যে এই 'উজ্জ্বলা যোজনা' একটা উজ্জ্বল ব্যতিক্রম সন্দেহ নেই।

তথ্যঋণ সংগৃহীত

উমা

সিঙ্গুরের পর ভাঙ্গর এবং...

অরুণ পালের লেখা ভাঙ্গর প্রসঙ্গে 'সিঙ্গুরের পর ভাঙ্গর' (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭ সংখ্যা) প্রতিবেদনটি পড়ে কিছু কথা মনে জাগে। প্রথমেই, মনে হয় এটি একটি প্রতিবাদধর্মী এবং একপেশে লেখা। এই লেখা (প্রতিবাদমূলক), তা কি শুধু প্রতিবাদের জন্য প্রতিবাদ? উত্তরটা খুঁজতে তলিয়ে ভাবা যাক।

একটা কথা আগেই বলে রাখা ভাল— আমি এই লেখার সমালোচনা করছি মানে এই নয় যে আমি প্রশাসনের পক্ষে সওয়াল করছি।

প্রতিবেদনে দেখছি ৪ লক্ষ ভোল্টের ওভারহেড লাইন নিয়ে যাওয়ার জন্য কৃষিজমি, মাছ, পাখি সর্বোপরি পরিবেশের বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু আমরা যদি সারা ভারতের দিকে তাকাই দেখতে পাব, সর্বত্রই মাইলের পর মাইল উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তার কৃষিজমি, পুকুর, নদীনালা পেরিয়ে দূরে দূরে দেশের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দিচ্ছে বিদ্যুৎ। আর এ কাজ বিদ্যুতের জন্মলগ্ন থেকেই চলে আসছে। আর পাওয়ার গ্রিড প্রকল্প পশ্চিমবাংলার আগেই অনেক প্রদেশে চালু হয়েছে। সে সব জায়গায় পরিবেশের বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যায় নি। এমনকি কোনো প্রতিবাদের কথাও জানা যায় নি। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তার নিয়ে যেতে গেলে সুউচ্চ ও মজবুত থামের নিশ্চয় প্রয়োজন। আর ঐ থামগুলি গড়তে বেশ কিছুটা জমি (সেটা চাষের জমিও হতে পারে) নষ্ট হয়। একথা অনস্বীকার্য এবং যেহেতু ঐ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তারগুলি তাদের চারপাশে একটা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি করে, তার নীচে বাড়ি তৈরি করা বা কোনও খুঁটি বা দাতব দণ্ড পোঁতা উচিত নয়। এ কথা স্বীকার করতেই হবে। তবে চাষের জমি, মাছ বা পাখি ও সর্বোপরি পরিবেশের ক্ষতি হবে এ কথা মানা যায় না।

তবে প্রশাসন জমি অধিগ্রহণের আগে এইসব সমস্যার কথা ভাঙ্গর অঞ্চলের অধিবাসীদের সুস্পষ্ট করে জানান নি এবং সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন নি, এটা ঘোরতর অন্যায়। জমি মাফিয়াদের মাধ্যমে মানুষকে ঠকিয়ে জমি অধিগ্রহণ করাও অপরাধ।

এবার বলি, যাঁরা এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষজনের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, বলছেন, তাঁদের ঘুম এতদিন বাদে ভাঙল কেন? ২০১২-২০১৩ সালে যখন জমি অধিগ্রহণ করা হয়, তখন কোথায় ছিল এই 'জমি বাঁচাও আন্দোলন'? যাঁরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন, তাঁরা কিন্তু ঐ অঞ্চলের লোক নন। যেমন জমি মাফিয়া আরাবুল ঠিক ঐ অঞ্চলের লোক নন। অন্যান্য জায়গার অভিজ্ঞতা বলে, সরকারিভাবে জমি অধিগ্রহণ করার বেশ কিছু দিন আগে তার আভাস পাওয়া যায়। এই আন্দোলন তো তখন বা তার অব্যবহিত পরেই শুরু হতে পারত? এটা ঠিক 'গোড়া কেটে আগায় জল' দেওয়া হল না কি?

সংবাদপত্র ও এই প্রতিবেদন পড়ে মনে হয়— এই আন্দোলনের নেতৃবর্গ মানুষের উপকার করতে চান নি। বরং চেয়েছিলেন নিজেদের রাজনৈতিক জমি সন্ধান করতে। যেটা আজ স্পষ্ট।

তাই মনে হয় কোনো ঘটনার পক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়াবার আগে যেমন তথ্য ও ইতিহাস সংগ্রহ প্রয়োজন তেমনি জনমানসে কান পাতাও প্রয়োজন।

অঞ্জন ঘোষ
বালী, হাওড়া